সাইমুম-২

অপারেশন তেলআবিব-২

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

কায়রো। হোটেল নাইল। হোটেলের কফিখানা। কফিখানায় প্রবেশ করল আবদুল্লাহ জাবের। সাইমুমের কায়রো অপারেশন স্কোয়াডের প্রধান ইনি।

তখন সন্ধ্যা সাতটা। কফিখানা ভর্তি। সামনের একটি টেবিলে একটি সিট খালি দেখতে পেল জাবের। টেবিলের ওপাশে আর একজন লোক বসা। পরণে নীল স্যুট। শ্যাওলা রং-এর টাই। আরবীয় ধরনের লম্বাটে রোদপোড়া মুখ। কিন্তু তার ঘোলাটে লাল চোখ আর চেপ্টা নাক খুব স্বাভাবিক নয়। জাবের গিয়ে বলল, "বসতে পারি আপনার টেবিলে?"

লোকটির হাতে ছিল সেদিনকার আ-আহরাম কাগজ। কাগজটির পাতায় ইতস্তত বিক্ষিপ্ত কলমের আঁচড়। কোনটি অনর্থক আঁচড়, কোনটি আরবী ও ইংরেজী বর্ণমালার কোন অক্ষর। কোনটি আবার কোন শব্দও হয়েছে। এমন ধরনের লোক আছে যাদের হাতে কলম যদি থাকে, কাগজ যদি পায়, আর অবসর সময়ও যদি থাকে তাহলে আর কোন কথা নেই- নিরুদ্দেশভাবে কলম তাদের চলবে। জাবের ভাবল লোকটি সেই প্রকৃতির। তার হাতে তখনও কলম ছিল। ইতস্তত কলম চালাচ্ছিল সে। কয়েকটি হিব্রু অক্ষর জাবেরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

মনোযোগ দিয়ে পড়ে চমকে উঠল জাবের। হুগো গ্যালার্ট? নামটি তার পরিচিত মনে হচ্ছে। এই সময় লোকটি মুখ তুলে জাবেরের প্রশ্নের জবাবে সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল। কথা বলল না।

জাবের বসল। এক কাপ কফির অর্ডার দিল সে। কিন্তু চিন্তা তার ঘুরপাক খাচ্ছে হুগো গ্যালার্ট নাম নিয়ে। হঠাৎ তার মনে পড়ল, গোপন বিশ্ব ইহুদী গোয়েন্দাচক্র 'ইরগুণ জাই লিউমি'র একজন স্পাই হুগো গ্যালার্ট। ইসরাইলদের তথ্য সরবরাহ করতে গিয়ে সেদিন তেলআবিবে ধরা পড়েছে সাইমুমের হাতে।

কথাটা মনে হবার সাথে সাথে জাবেরের সমগ্র চেতনা সক্রিয় হয়ে উঠল। এই লোক হুগো গ্যালার্টের নাম জানল কি করে? হুগো গ্যালার্টের নাম জানে সাইমুম, ইসরাইল গোয়েন্দা এবং ইরগুণ জাই লিউমি। লোকটি সাইমুমের নয় মোটেই, তাহলে কি শেষোক্ত দল দু'টির কোন একটির? আবার মনে হলো জাবেরের, হুগো গ্যালার্ট নাম হয়ত আরো থাকতে পারে। এমনকি লোকটির নাম হুগো গ্যালার্ট-এমনও হতে পারে। কিন্তু জাবেরের মনে প্রশ্ন জাগল লোকটি হিব্রু জানল কি করে? ভাষাটা ইহুদীদের নিজস্ব এবং ওরাই ভাষাটিকে পুর্নজীবিত করে তুলছে। সুতরাং নামের ব্যপারটিকে কো-ইনসিডেন্স ধরলেও লোকটির হিব্রু জ্ঞান স্বাভাবিক নয়।

জাবের কফির কাপ থেকে মুখ তুলল। চাইল লোকটির দিকে। টেবিলের পাশে রাখা হ্যাট তুলে মাথায় পরছে সে। কপাল ও চোখের একাংশ অস্পষ্ট হয়ে গেছে। ক্লিন-সেভড মুখ। নিচের ঠোঁট ও থুতনির মাঝামাঝি জায়গায় একটি ছোট কাটা দাগ। লোকটি কাগজ মুড়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

জাবের মুহূর্তে সিদ্ধান্ত ঠিক করে নিল। লোকটি কফিখানা থেকে বেরিয়ে যেতেই জাবেরও উঠে দাঁড়াল। কফিখানা থেকে বেরিয়ে এসে জাবের দেখল, লোকটি রিসেপশন রুমের পাশ দিয়ে লিফটরুমে গিয়ে ঢুকল। লোকটি কি তাহলে হোটেলের বাসিন্দা? ভাবল জাবের। লিফটে অনুসরণ করা সমীচীন মনে করল না সে। সন্দেহের কোন অবকাশ দিতে চায় না জাবের। সে রিসেপশন কাউন্টারের সামনে সোফায় গিয়ে বসল।

মাত্র ন'মিনিট। লোকটি ফিরে এল। লিফট-রুম থেকে বেরিয়ে কাউন্টারে এসে সে রিসেশনিস্টকে তার ঘরের চাবি দিয়ে দিল। জাবের দেখল, ৩০১ চিহ্নিত প্লাকে চাবিটি আটকিয়ে রাখল রিসেপশনিস্ট। ৩০১ সংখ্যাটি জাবের কয়েকবার উচ্চারণ করল মনে মনে।

হোটেলের দরজায় গিয়ে কিছুক্ষণ দাঁড়াল লোকটি। একবার সময় দেখলো। তারপর বেরিয়ে গেল হোটেল থেকে।

আবদুল্লাহ জাবের যখন তার গাড়ীতে উঠে বসল, তখন লোকটির ভাড়া করা ট্যাক্সি ছেড়ে দিয়েছে গাড়ীর রিয়ার লাইটে গাড়ীর নম্বর স্পষ্ট হয়ে উঠল। সাইমুম কর্মী তৌফিকের গাড়ী ওটা। ঘটনার অভাবনীয় আনুকূল্যের জন্য জাবের আল্লাহকে অশেষ শুকরিয়া জ্ঞাপন করল।

নাসের এভিনিউ ধরে গাড়ী এগিয়ে চলেছে। সন্ধ্যার রাজপথ। প্রচন্ড ভীড় গাড়ীর। নাসের এভিনিউ পার হয়ে গাড়ী ফারুক এভিনিউতে পড়ল। জাবের সাইমুমের সাউন্ড-কোর্ড-এ তৌফিকের উদ্দেশ্যে সংকেত পাঠালো। কয়েক সেকেন্ড পর সামনের গাড়ী থেকে পরিচিত সংকেত এল গাড়ীর হর্ণ থেকে।

গাড়ী আতাবা-আল-খাদরায় প্রবেশ করল। কায়রো শহরের পুরাতন আর নতুন অংশের এটা সংগমস্থল। এখান থেকে ডজন খানেকেরও বেশী বড় ও ছোট রাস্তা শহরের বিভিন্ন দিকে চলে গেছে। আতাবা আল খাদরা থেকে তৌফিকের গাড়ী ইবনুল আরাবী রোড ধরে পূর্ব দিকে এগিয়ে চলল। নীল নদের তীর ঘেঁষে গওহর রোড। ইবনুল আরাবী রোড এই গওহর রোডে গিয়ে মিশেছে। তৌফিকের গাড়ী এসে গওহর রোডের উপর নীল নদের তীর ঘেঁষে নির্মিত গওহর মসজিদের পাশে দাঁড়াল। ফাতেমী বংশের খলিফা আল-মুইজের সেনাপতি গওহর এই মসজিদের নির্মাতা। তিনি কায়রো শহরেরও প্রতিষ্ঠাতা। শহরটি প্রতিষ্ঠিত হয় ৯৬৯ খৃষ্টাব্দে।

লোকটি গাড়ী থেকে নেমে তৌফিককে তার ভাড়া মিটিয়ে দিল। পকেট থেকে টাকা বের করার সময় এক টুকরো কাগজ লোকটির পকেট থেকে পড়ে গেল। তৌফিককে একটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করার জন্য মুখ তোলায় সে এটা লক্ষ্য করতে পারলো না।

ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সে নদীর ধারে বেঁধে রাখা 'দাহাবিয়া'র দিকে এগিয়ে গেল। 'দাহাবিয়া' বজরা নৌকা বিশেষ। নীল নদীতে ভ্রমণ, নদী পারাপার ইত্যাদি কাজের জন্য এগুলো ব্যবহৃত হয়। নদীতে ভ্রমণের জন্য বৈকালে লোকের প্রচুর ভীড় জমে। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেছে তবু অনেক লোকজন দেখা যাচ্ছে। লোকটি একটি দাহারিয়ায় গিয়ে উঠল।

জাবের তৌফিকের পাশে এসে দাঁড়াতেই তৌফিক লোকটির পকেট থেকে পড়ে যাওয়া কাগজটি তার হাতে দিল। সেই হিব্রু লিখা। জাবের পড়ল,

"আজ রাত ৮-১৫ ৯নং জাজিরা-৩"

নীল নদের মধ্যে ছোট সুন্দর দ্বীপ রয়েছে। এই দ্বীপগুলোকে বলে জাজিরা। এই জাজিরাগুলোতে সুন্দর সুন্দর বাড়ী তৈরী করে বাস করছে কায়রোর ধনী অভিজাত আর বড় বড় সরকারী কর্মচারীরা। জাজিরার বাড়ীগুলো দেখতে খুব সুন্দর। প্রায় প্রতিটি বাড়ীর সামনে বাগান। বিখ্যাত বিদেশী গাছে ঘেরা বাড়ীগুলো। রাজতন্ত্রের যুগে জাজিরাগুলো আমির-ওমরাহদের বাসস্থান হিসেবে প্রায় নির্দিষ্ট ছিল। মিসরের অনেক উত্থান-পতন এবং অগণিত অঘটন সংঘটনের ইতিহাসের সাথে এই জাজিরাগুলোর নাম জড়িত। জাবের লিখাটির অর্থ করল, আজ রাত দশটায় তিন নম্বর জাজিরার নয় নম্বর বাড়ীতে একটা কিছু হচ্ছে। লোকটি জাজিরার সেই বাড়ীতেই তাহলে যাচ্ছে।

৩নং জাজিরার নয় নম্বর বাড়ী-মনে মনে সন্ধান করল জাবের। মরহুম ফিল্ড মার্শল আবদুল হাকিম আমরের বাড়ী এই জাজিরাতে। এই জাজিরাতেই মেজর জেনারেল আবুদল হাফিজ রশিদ এবং কায়রো গ্যারিসনের জেনারেল অফিসার কমান্ডিং ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীর গ্রীষ্মাবাস। এছাড়াও সরকারী ও বেসরকারী আরও কয়েকজন অভিজাত পরিবার বাস করেন এই জাজিরাতে। কিন্তু জাবের ঠিক করতে পারলো না কোন বাড়ীটির নম্বর 'নয়'।

-ফিল্ড মার্শল আবদুল হাকিম আমরের বাড়ীর নম্বর কত তুমি জান তৌফিক? তৌফিকের দিকে চেয়ে জিজ্ঞেস করল জাবের।

তৌফিক তাড়াতাড়ি তার ড্রাইভিং সিটের তলা থেকে একটি ক্ষুদ্র নোটবই বের করল। নোটবই দেখে তৌফিক বলল, পাঁচ নম্বর।

-আর নয় নম্বর বাড়ী? পুনরায় জিজ্ঞেস করল জাবের।

-নয় নম্বর বাড়ী হ'ল ফখরুদ্দীন আলী সাহেবের। কিন্তু তিনি গ্যারিসনের স্টাফ কোয়ার্টারেই বাস করেন। মাস খানেক হলো বোধ হয় তিনি বাড়ীটি ভাড়া দিয়েছেন। সাইপ্রাসের ইসহাক এমিল নামের একজন ধনী ব্যবসায়ী এই বাড়ীটিতে বাস করছেন এখন।

-লোকটিকে তুমি দেখেছ?

-একবার দেখেছি। বয়স ৪৫ থেকে ৫০। মাথায় টাক। গ্রীকদের মত আরবী উচ্চারণ। মুসলমান বলে মনে হয়নি আমার কাছে।

-কেন?

-লোকটি হিব্রু জানে, অথচ তুর্কি জানে না। সাইপ্রাসে টারকিশ সাইপ্রিয়টদের সংস্পর্শে বাস করে তুর্কি জানে না-এটা অবিশ্বাস্য।

-ঠিক বলেছ তৌফিক। কিন্তু লোকটি হিব্রু জানে কেমন করে বুঝলে তুমি?

-আমি একদিন তাকে লিফট দিয়েছিলাম। ভাড়া নেবার সময় তার তর্জ্জনীর সোনার আংটিতে একটি হিব্রু অক্ষর দেখেছি।

জাবের কিছুক্ষণ চিন্তা করল। তারপর কিছুটা স্বগত স্বরেই বলল, তুমি আজ যাকে লিফট দিলে, সেও হিব্রু জানে এবং সে যেখানে যাচ্ছে সেখানেও হিব্রু জানা লোক, এর অর্থ কি তৌফিক।

-অর্থ পরিষ্কার, Another jews Conspiracy (আর একটি ইহুদী ষড়যন্ত্র)।

-কিন্তু একেবারে তা ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলীর বাড়ীতে বসে?

-জি, এটা বিস্ময়কর বটে।

নীল নদের একটি ক্ষুদ্র জাজিরা। ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলীর বাসভবন। বাড়ীর চারদিকে ঘেরা বাগান। বাগানের বহিঃপ্রান্ত দিয়ে কাঁটা তারের বেড়া। বাড়ীর সামনে বিরাট লোহার ফটক। সেখান থেকে বাগানের মধ্যে দিয়ে

একটি লাল শুড়কীর রাস্তা গাড়ী বারান্দায় গিয়ে ঠেকেছে। বাড়ীর দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে বিভিন্ন প্রকার বিদেশী গাছ লাল রং এর বাড়ীটি ঘিরে সবুজের মেলা বসিয়েছে। বাড়ীর এই অংশ অনেকটা অন্ধকার। বাড়ীর প্রধান অংশ উত্তর ও পূর্বদিকে। দক্ষিণ দিকে প্রচীর দিয়ে ঘেরা। পশ্চিম দিকে রান্না ও ভাড়ার ঘর। দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে কোন আলো দেখা যাচ্ছে না। গাছের ছায়ায় এ অংশে অন্ধকার আরো ঘনিভূত হয়ে উঠেছে।

দ্বিতলের একটি হলঘর উজ্জ্বল আলোতে ঝলমল করছে। ঘরটির দক্ষিণ, পশ্চিম ও উত্তর দিকে একটি করে কাঁচের জানালা। জানালাগুলো বন্ধ। সেগুলো আবার কালো পুরু কাপড় দিয়ে ঢাকা। এর ফলে ঘরের অভ্যন্তরের কথা ও দৃশ্য-দুটোরই বর্হিগমন রুদ্ধ হয়েছে। দক্ষিণের জানালার সামনে একটি বড় সোফা। এতে বসেছেন ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলী এবং এসহাক এমিল। এ সোফার পূর্ব পাশে আর একটি সোফা। এটাতে বসেছে হোটেল নাইল থেকে আগত সেই লোকটি। সোফার সামনে টি পয় দু'টির উপর কফির খালি পেয়ালা পড়েছিল। বেয়ারা এসে কুড়িয়ে নিয়ে গেল। সে বেরিয়ে যাবার সময় ভালো করে দরজা এটে দিল। বেয়ারা বেরিয়ে যাবার পর ইসহাক এমিল নড়েচড়ে বসল। বলল, এবার বলুন মিঃ আলী।

ব্রিগেডিয়ার আলী বললেন, আমার প্রস্তুতি সম্পূর্ণ। আলেকজান্দ্রিয়া নৌঘাঁটির ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফ, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈয়দের সহকারী সেনাধ্যক্ষ কর্ণেল শরিফ ও আহসানের সমর্থন আমি পেয়েছি। এছাড়া কায়রো বিমান ঘাটির এয়ার কমোডর ফারুকী এবং স্কোয়ার্ডন লিডার সেলিম ও কামালও যোগ দিয়েছে আমার সাথে। আপনাদের সহযোগিতা পেলে আমি সফল হবো আশা করি।

ইসহাক এমিল পাশের সোফায় বসা হোটেল নাইল থেকে আগত লোকটির দিকে ইশারা করে বলল, এ সম্পর্কে বিস্তারিত প্রোগ্রাম নিয়ে এসেছেন মিঃ স্যামুয়েল আলফ্রেড। সবকিছু তিনিই জানাবেন।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বিশ্ব ইহুদী আন্দোলনের গোপন প্রতিষ্ঠান 'ইরগুণ জাই লিউমি'র একজন বিশিষ্ট সদস্য। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আলীর কাছে তার

পরিচয় বিশ্বশান্তি পরিষদের (ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড)-এর একজন মুখপাত্র হিসেবে। ইসহাক এমিলেরও এই পরিচয় তার কাছে। ব্রিগেডিয়ার আলীকে বোঝান হয়েছে, বিশ্ব শান্তির জন্য মিসরের বর্তমান সরকারের পরিবর্তন বিশ্বের শান্তিকামীদের কাম্য। বর্তমান আনোয়ার রশিদ সরকারের পরিবর্তনে মধ্যপ্রাচ্যে প্রতিবেশী রাষ্ট্রগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহ অবস্থান সম্ভব হবে বলে তাঁকে জানানো হয়েছে এবং ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড এবং বিশ্বের শান্তিকামীদের তরফ থেকে ব্রিগেডিয়ার আলীকে আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে, রশিদ সরকারের পরিবর্তে তাকে মিসরের ক্ষমতায় আসীন করতে সব সহযোগিতা দান করা হবে। স্যামুয়েল আলফ্রেড এসেছেন ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড তথা বিশ্বশান্তি পরিষদের তরফ থেকে তার সুস্পষ্ট বক্তব্য নিয়ে।

ইসহাক এমিল থামলে স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, মিঃ আলী আমাকে শুধু ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেডের মুখপাত্র বলেই আপনি মনে করবেন না, শান্তিকামী রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারী বক্তব্যও আমিই বহন করে এনেছি। বলে স্যামুয়েল আলফ্রেড তার পকেট থেকে তিনটি চিঠি বের করে ব্রিগেডিয়ার আলীর হাতে দিলেন। চিঠিগুলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও রাশিয়ার প্রতিরক্ষা দপ্তরের এবং সেগুলোতে এসব দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সহি ও সীলমোহর রয়েছে।

স্যামুয়েল আলফ্রেড আবার শুরু করলেন, ১১ই রবিউল আউয়াল সন্ধ্যায় প্রধান সেনাপতি জেনারেল আবু তারিক আল জামাল এক গোপন সফরে দেশের বাইরে যাচ্ছেন, আমরা চাই তারা যেন আর কোন দিন দেশে ফিরে আসতে না পারেন।

স্যামুয়েল আলফ্রেডের কথা শেষ না হতেই ব্রিগেডিয়ার আলী প্রশ্ন করলো, তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন ঐ দিন।

স্যামুয়েল একটু হাসল। বলল তারপর, বিশ্ব শান্তির শত্রু সাইমুম আহূত সম্মেলনে যোগ দিতে সৌদী আরবে। স্যামুয়েল থামল একটু। তারপর বলল আবার, ১১ তারিখ দিনগত রাত ও ১২ তারিখের দিনের মধ্যেই সব কাজ সম্পন্ন করতে হবে। সম্ভব হলে এর আগেও অভ্যুত্থান চলতে পারে, কিন্তু কোন ক্রমেই

তা ১২ই রবিউল আউয়াল থেকে পিছিয়ে দেয়া চলবে না। ১২ই রবিউল আইয়াল চুড়ান্ত।

ব্রিগেডিয়ার আলী বলল, রশিদ সরকারের অনুগত সামরিক অফিসারদের বিস্তৃত লিষ্ট তৈরী সম্পন্ন হয়েছে। প্রথম আঘাতেই আমরা ওদের সরিয়ে ফেলবো, তারপরের কাজ খুব কঠিন হবে না আমাদের জন্য। কিন্তু ভাবছি আমি রশিদ সরকারের বন্ধু এবং সাইমুমের প্রভাবাধীন পার্শ্ববতী আরব রাষ্ট্রগুলোর কথা। যদি ওদের সাহায্য পেয়ে ডিফেন্স তৈরী হয় আমাদের বিরুদ্ধে?

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, এ চিন্তা আমরাও করেছি, কিন্তু এতে উদ্বেগের কিছুই নেই। কায়রো বেতার থেকে আপনাদের অভ্যুত্থান ও নতুন সরকার গঠনের কথা ঘোষিত হবার পর মুহূর্তেই রাশিয়া, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল প্রভৃতি রাষ্ট্র আপনার নতুন সরকারকে স্বীকৃতি ও সমর্থন দিবে। যদি পার্শ্ববর্তী বা বাইরের কোন দেশ সামান্য হস্তক্ষেপেরও চেষ্টা করে মিসরের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে, তাহলে নতুন সরকারের নিরাপত্তার জন্য ঐ রাষ্ট্রসমূহ এগিয়ে আসবে এবং এজন্য তারা যে কোন ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত। এমন কি আপনার সরকার যদি অভ্যন্তর থেকেও কোন মারাত্মক প্রতিকূলতার সম্মুখীন হয়, তাহলে যে কোন সাহায্যের জন্য ইসরাইলী সশস্ত্র বাহিনী প্রস্তুত থাকবে। গত ১৯৬৭ সালের যুদ্ধে পাওয়া মিসরীয় বিমান বাহিনীর প্রতীক সম্বলিত কিছু বিমান ও মিসরীয় বাহিনীর বহু ট্যাংক ইসরাইলের কাছে রয়েছে, প্রয়োজনবোধে ইসরাইল এসব আপনার সরকারের সাহায্যের জন্য নিরাপদে ব্যবহার করতে পারবে।

ব্রিগ্রেডিয়ার আলী বলল, আমি কৃতজ্ঞ থাকব আপনাদের সাহায্যের জন্য।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, সব সাহায্যের বিনিময়ে আমরা কয়েকটি শর্তের প্রতি আপনার স্বীকৃতি দাবী করছি –

(১) সাইমুমের সাথে আপনার সরকার কোন সম্বন্ধ রাখতে পারবে না এবং যাদের সাথে বা যে সরকারের সাথে সাইমুমের সম্পর্ক আছে, তাদের সাথে আপনার সরকার কোন সম্পর্ক রাখতে পারবে না।

(২) ইসরাইলের সাথে মিসর প্রতিরক্ষা চুক্তিতে যোগ দেবে।

(৩) মিসর ‘ওয়ার্ল্ড পিস ব্রিগেড’-এর সদস্য হবে।

কথা শেষ করে থামল স্যামুয়েল আলফ্রেড।

ব্রিগেডিয়ার আলী কিছুক্ষণ ভেবে নিয়ে বলল, শর্তগুলোর কোনটিই কঠিন নয় এবং ঐগুলোর সাথে আমি একমত। কিন্তু দ্বিতীয় শর্তটি জনমনের সাথে সম্পর্কিত ও সেন্টিমেন্টাল। এর বাস্তবায়ন কিছুটা সময় সাপেক্ষ হতে পারে, তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও বৃটেনের সাহায্য সহযোগিতা পেলে তা কঠিন হবে না মোটেই।

স্যামুয়েল আলফ্রেড বলল, শুনে খুশী হলাম। আমরা সকলে সেই শুভ দিনটির অপেক্ষা করব।

ইসহাক এমিল তার সামনের টি পয়ের একটি সুইচে চাপ দিল। কিছুক্ষণ পরে একটি ট্রেতে করে ফরাসী লেবেল দেয়া মদের দু’টি বোতল আর কয়েকটি গ্লাস নিয়ে প্রবেশ করল বেয়ারা।

ফরাসী হুইস্কি নিয়ে যখন ওরা ব্যস্ত হয়ে পড়ল তখন দেখা গেল দক্ষিণের জানালায় একটি ছায়ামূর্তি অতি সন্তর্পণে একটি হাই সেন্সেটিভ রেডিও রিসিভার তার সমেত গুটিয়ে নিয়ে পকেটে রাখল। কাঁচের জানালার ১ বর্গফুট পরিমিত স্থান থেকে কাঁচ কেটে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। সেই পথ দিয়ে একটি হাই সেন্সেটিভ রেডিও রিসিভার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দেয়া হয়েছিল। রেডিও রিসিভারের বাইরের প্রান্তে একটি রেকর্ডার সংযুক্ত ছিল।

ছায়ামূর্তিটি আর কেউ নন আবদুল্লাহ জাবের। ঘরের ভেতরের সবগুলো কথাই জাবের শুনেছে। বিস্ময় ও উত্তেজনায় সে ঘেমে উঠেছে। কি জঘন্য তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। জাবের নিশ্চিত ইসহাক এমিল এবং স্যামুয়েল আলফ্রেড দু’জনেই গোপন বিশ্বইহুদী গোয়েন্দাচক্র ‘ইরগুণ জাই লিউমি’র লোক। জাবের বুঝতে পারছে,

ইহুদীদের এটা মরণ কামড়। সাইমুমের কাজ এবং পরিকল্পনাকে কোন পথে বানচাল করতে না পেরে, অবশেষে মুসলমানদের ঐক্যে ফাটল ধরিয়ে শেষ রক্ষা করতে চাচ্ছে তারা। রশিদ সরকারের পরিবর্তন ঘটিয়ে পুতুল সরকারের পত্তন করে ইহুদীরা একদিকে সাইমুম আহূত আসন্ন আরব-সম্মেলনকে বানচাল করতে

চাচ্ছে, অপরদিকে ফিলিস্তিনের মুক্তি পরিকল্পনাকে নস্যাৎ করে দিতে চাচ্ছে। সাইমুমের হেড কোয়ার্টারে অবিলম্বে খবর পৌঁছানো দরকার। জাবের চঞ্চল হয়ে উঠল। প্রতিটি মুহূর্ত তার কাছে মনে হচ্ছে একযুগ।

কার্নিস বেয়ে পা টিপে টিপে জাবের পানির পাইপের দিকে এগুলো। পানির পাইপ ওখান থেকে মাত্র তিনগজ দূরে। এই তিনগজ স্থান পার হতে জাবেরের সময় লাগল পুরো সাত মিনিট।

জাবের যখন তার ঘাটিতে ফিরে এল, তখন রাত দশটা। পৌঁছেই সে বাড়ীর চিলে কোঠায় উঠে গেল। এখানে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন রেডিও ট্রান্সমিটার রয়েছে। জাবের রেডিও ট্রান্সমিটারের পাশে বসা ইঞ্জিনিয়ার আকরম ফারুকের পাশে বসে মেসেজ তৈরী করল এবং তা আকরম ফারুকের হাতে দিয়ে দিল। মেসেজটি আম্মানে সাইমুমের হেড কোয়ার্টারে পাঠাতে ৭ মিনিট সময় লাগল।

মেসেজটি পাঠানোর পরও জাবের সেই রেডিও রুমেই রইল। তার চঞ্চল চোখ বার বার রেডিও রিসিভারের উপর দিয়ে ঘুরে আসছে। তার কান দু'টি উৎকর্ণ হয়ে আছে রেডিও রিসিভার থেকে 'ঝিৎস' শব্দ শোনার জন্য। জাবের নিশ্চিত, জরুরী কোন নির্দেশ হেড কোয়ার্টার থেকে আসছে। এক মিনিট দু'মিনিট করে গত হ'ল ১ ঘন্টা ১৫ মিনিট। হঠাৎ রেডিও রিসিভারে একটি লাল আলো জ্বলে উঠল এবং সাথে সাথে ভেসে এল মিষ্টি সিগন্যাল। আরও পাঁচ মিনিট গত হ'ল। রেডিও ইঞ্জিনিয়ার আকরম ফারুক একটি মেসেজ এনে জাবেরের হাতে দিল।

জাবের দ্রুত চোখ বুলাল তাতেঃ

"জাবের, প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদের সাথে কথা হল। তিনি তোমার জন্য অপেক্ষা করছেন। আমি হেড কোয়ার্টারে। তুমি এখনই যাও। খোদা সহায়, তোমাদের মিলিত প্রচেষ্টা বিশ্ব-ইহুদী আর তার মুরুব্বীদের ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিতে পারবে। আহমদ মুসা।"

মেসেজটি পড়া শেষ করে জাবের উঠে দাঁড়াল। দ্রুত নেমে গেল নীচে।

রাত সাড়ে এগারটা। জনবিরল রাজপথ। ঘন্টায় ৮০ মাইল বেগে উর্ধ্বশ্বাসে এগিয়ে চলেছে জাবেরের কাডিলাক।

কায়রো আর্মি হেড কোয়ার্টারের প্রশস্ত গেট। উচিয়ে ধরা সঙ্গীনের সামনে এসে জাবেরের গাড়ী ক্যাচ করে এক শব্দ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। জাবের গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে বলল, আমি আব্দুল্লাহ জাবের। সঙ্গে সঙ্গে উচিয়ে ধরা সঙ্গীনের মাথা নেমে গেল। আর পর মুহূর্তেই খুলে গেল ফটক। জাবেরের গাড়ী এগিয়ে চলল। আঁকা-বাঁকা অনেক পথ পার হয়ে হেড কোয়ার্টারের বারান্দায় এসে দাঁড়াল তার গাড়ী। গাড়ী থেকে নামতেই দেখা হল সহকারী সেনাধ্যক্ষ লেঃ জেঃ আহসান আল-জামিলের সাথে। তার চোখ মুখে উত্তেজনার ছাপ। বলল, আসুন আপনার জন্য সবাই অপেক্ষা করছেন।

তারা একটি হল ঘরে প্রবেশ করল। লোকারণ্য হল ঘরটি। বিশাল সেক্রেটারিয়েট টেবিল। মাঝখানের চেয়ারটিতে প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদ বসে আছেন। তার ডান পাশে প্রধান সেনাপতি আবু তারিক আল-জামাল। প্রধান সেনাপতির ডান পাশে বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অধিনায়কদ্বয় বসেছেন। এছাড়া মন্ত্রী পরিষদের সদস্যবৃন্দ এবং সেনাবাহিনীর কয়েকজন গুরুত্বপূর্ণ অফিসার রয়েছেন। আনোয়ার রশিদের সামনে একটি চেয়ার খালি ছিল। সেখানে গিয়ে বসল আবদুল্লাহ জাবের।

আনোয়ার রশিদ প্রশান্ত দৃষ্টিতে চাইলেন জাবেরের দিকে। বললেন, আহমদ মুসার কাছে কিছু ইংগিত পেয়েছি মাত্র। আপনার কাছ থেকে বিস্তারিত জানার জন্য আমরা উদগ্রীবভাবে অপেক্ষা করছি।

কোন ভূমিকা না করে জাবের বলল, একজন সন্দেহজনক ব্যক্তিকে অনুসরণ করে জাজিরার একটি বাড়ীতে গিয়েছিলাম। বাড়ীটি ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীর। আমি সেখানে ‘ইরগুণ জাই লিউমি’র দু’জন লোকের সাথে ব্রিগেডিয়ার আলীকে এক পরামর্শ সভায় মিলিত হতে দেখেছি। তাদের আলোচনার রেকর্ড আমার কাছে রয়েছে। রেকর্ডই আপনাদের সব বলবে। বলে জাবের পকেট থেকে ক্ষুদ্র রেকর্ডার বের করল। রেকর্ডারটির সাথে তখনও রেডিও রিসিভার সংযুক্ত ছিল। রেডিও রিসিভারটি খুলে নিয়ে জাবের রেকর্ডারটি টেবিলের উপর রাখল।

জাবের লাউড স্পিকারের সাথে জুড়ে দিলেন রেকর্ডারটি। সমগ্র হলঘরে অখন্ড নিরবতা। রেকর্ডারটি বেজে চলেছে। দু'টি কণ্ঠস্বর অপরিচিত। কিন্তু ব্রিগেডিয়ার আলীর কণ্ঠস্বরটি চিনতে পারছে ঘরে উপস্থিত সবাই। প্রেসিডেন্ট রশিদের মুখ নত। চোখের নিষ্পলক দৃষ্টি টেবিলে নিবদ্ধ। তার মুখে কোন ভাবান্তর লক্ষ্য করা যাচ্ছে না। প্রধান সেনাপতি, বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অধিনায়কদের ভীষণ উত্তেজিত দেখা যাচ্ছে। মন্ত্রীদের মুখমন্ডল বিবর্ণ। রেকর্ড শেষ হয়ে এল। জাবের সুইচ টিপে বন্ধ করে দিলো রেকর্ড।

কিছুক্ষণ নিরব সবাই। প্রথম কথা বলল, প্রধান সেনাপতি আবু তারিক, এবার তাহলে সবকয়টা বৃহৎ শক্তিই ইহুদীদের পেছনে এসে দাঁড়ালো।

জাবের বলল, দাঁড়াল নয় জনাব, দাঁড়িয়েছিল শুরু থেকেই। ইসরাইলকে তো ওরাই সৃষ্টি করেছে তাই ওরা ইসরাইলকে লালন করবে তা বিচিত্র নয়।

বিমান বাহিনীর তরুণ অধিনায়ক মার্শাল আব্দুল্লাহ সোহায়েল বলল, এ ষড়যন্ত্র রশিদ সরকারের বিরুদ্ধে নয়, এ ষড়যন্ত্র কোটি কোটি নিপীড়িত জনতার স্বার্থের বিরুদ্ধে। সুতরাং মিসর সরকারের সামরিক অফিসার হিসেবে শুধু নয়, একজন মুসলমান হিসেবে দায়িত্ব এসেছে আমাদের উপর এ ষড়যন্ত্র ধ্বংস করে দেবার। আমরা নির্দেশ চাই। তার কণ্ঠস্বর আবেগে রুদ্ধ হয়ে এল শেষের দিকে।

প্রধান সেনাপতি আবু তারিক প্রেসিডেন্ট রশিদের মুখের দিকে তাকালেন। তিনিও মুখ তুলেছেন। গম্ভীর কণ্ঠ শোনা গেল তাঁর। প্রধান সেনাপতিকে তিনি বললেন, রাত্রি ভোর হবার আগে ষড়যন্ত্রকারীদের সবাইকে এখানে হাজির করো আবু তারিক। তারপর জাবেরের দিকে চেয়ে তিনি বললেন, কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে লজ্জা দিব না আপনাদের। জাতির সেবায় আমাদের চেয়ে অনেক উর্ধ্বে আপনারা। আমি আশা করি আমাদের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে আজ আপনাদেরকেও আমরা পাব।

জাবের বলল, আমাদের সমস্ত শক্তি আপনাদের সাথে থাকবে। কিন্তু একটি অনুরোধ, 'ইরগুন জাই লিউমি'র লোকদের আমাদের হাতে দিতে হবে। ওদের বিচার আমরাই করবো।

প্রেসিডেন্ট রশিদ বললেন, আপনার ইচ্ছা পূর্ণ হবে। প্রেসিডেন্ট রশিদ উঠে দাঁড়ালেন। উঠে দাঁড়ালেন সবাই।

পরদিন আল আহরাম পত্রিকায় খবর বেরুল,

“মিসরে সামরিক অভ্যুত্থানের ব্যর্থ চেষ্টা

বিগ্রেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলীসহ আরো পঁচিশজন

সামরিক অফিসার ধৃত”

খবরে সামরিক সূত্রের বরাত দিয়ে বলা হয়েছে, কায়রো গ্যারিসনের জি, ও, সি, ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দীন আলী মোবারকের নেতৃত্বে রশিদ সরকারকে উৎখাতের ষড়যন্ত্র করা হয়েছিল। এ ষড়যন্ত্রের সাথে কোন কোন বিদেশী শক্তির গোপন হাত ছিল বলে খবরে উল্লেখ করা হয়েছে। খবরে বলা হয়েছে, রশিদ সরকারকে উৎখাত করে মিসরে একটি প্রো-ইসরাইলী সরকার গঠন ষড়যন্ত্রকারীদের উদ্দেশ্য ছিল।

উপরোক্ত খবরের পাশে আর একটি খবর। খবরটিতে রশিদ সরকারের বিপদ-উত্তরণে খোশ আমদেদ জানিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের কাছ থেকে বার্তা এসেছে। এদের মধ্যে প্রথমেই রয়েছে রাশিয়া, বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নাম।

কায়রোর পথে ঘাটে, রেস্তোরাঁয় যখন ব্যর্থ অভ্যুত্থানের বিষয় নিয়ে আলোচনা চলছে, তখন আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের দক্ষিণ পাশের তিনতলা বাড়ীটির ভুগর্ভস্থ একটি কক্ষের তড়িৎ আসনে শায়িত ‘ইরগুণ জাই লিউমি’র কায়রো প্রধান ইসহাক এমিল তার স্পাই নেট ওয়ার্কের বিবরণ বলে যাচ্ছে। লিখে নিচ্ছে আবদুল্লাহ জাবের।

জাবের বলছে, কায়রো, ইসমাইলিয়া ও পোর্ট সৈয়দে তোমাদের লোকদের পরিচয় দিলে, আলেকজান্দ্রিয়ায় তোমাদের লোকদের পরিচয় এখনও দাওনি।

এমিল বলল, বিশ্বাস করুন, ওখানে আমাদের কোন লোক নেই।

জাবের বলল, আমি জানি ওখানে তোমাদের গুরুত্বপূর্ণ লোক রয়েছে। তোমাকে বলতে হবে, ভাই এ্যাডমিরাল আলী আশরাফের সাথে তোমাদের কোন লোক যোগাযোগ করেছিল?

এমিল নীরব। ইলেকট্রিক মেগনেটো আবার হাতে তুলে নিলো জাবের। বিবর্ণ হয়ে গেল ইসহাক এমিলের মুখ। বলল সে, বলব-বলছি আমি।

জাবের ফিরে এসে তার সামনে বসল। বলে চলল এমিল, আলেকজান্দ্রিয়ার হোটেল প্রিন্স-এর পরিচারিকা মিস জামিলা ও মিস রায়হানা আমাদের লোক। ওদের প্রকৃত ইহুদী নাম ইলিহ এবং ইশতার ফ্রেডম্যান। গত দু'মাস ধরে তারা চাকুরি করছে ওখানে মুসলিম মহিলার ছদ্মবেশে। 'আলি ব্রাদারস এন্ড কোং' ডিপার্টমেন্টাল স্টোরের সেলসম্যান ফারুকী এবং মিস সেলিনা আমাদের পক্ষে কাজ করছে। ওদের প্রকৃত ইহুদী নাম জোসেফ পাপ এবং সিদি মার্কস। থামল এমিল।

জাবের চিন্তা করল কিছুক্ষণ। তারপর বলল, ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফের সাথে তোমাদের যোগাযোগ হয়েছিল কিভাবে? আর তোমাদের লোকেরা 'হোটেল প্রিন্স' ও 'আলী এন্ড ব্রাদার্স'-এ চাকুরিই বা পেল কেমন করে?

এ প্রশ্নের উত্তর দিতে কোন দ্বিধা করল না এমিল। সে বলল, আজ থেকে ছয় মাস আগে 'ইরগুণ জাই লিউমি' আমাদেরকে মিসরে প্রেরণ করে। 'ইরগুন জাই লিউমি'র পক্ষ থেকে ইসরাইলের জন্য মিসরের গোপন সামরিক তথ্যাদি সংগ্রহ করা ছিল আমাদের দায়িত্ব। আমরা জানতাম, মিসরের উর্দ্ধতন সামরিক অফিসারদের সংস্পর্শে না আসতে পারলে, এ ধরনের খবর সংগ্রহ সম্ভব নয়। আমরা এই প্রচেষ্টাই শুরু করলাম। সুন্দরী নারী এবং অর্থই ছিল আমাদের প্রধান হাতিয়ার। মিসরের অফিসারদের পেছনে আমরা যেসব সুন্দরী ইহুদী তরুণী লেলিয়ে দিয়েছিলাম মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার ফ্রেডম্যান ছিল তাদের অন্যতম। মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার ফেডম্যান মাত্র ১৫ দিনের চেষ্টায় ভাইস এডমিরাল আলী আশরাফকে শয্যা সঙ্গী করতে সমর্থ হয় এবং পরবর্তীকালে সে আমাদের মুঠায় এসে যায়। তারই সাহায্যে মিস ইলিহ্ ও মিস ইশতার জোসেফ পাপ ও সিদি মার্কস চাকরি লাভ করে।

-ব্রিগেডিয়ার ফখরুদ্দিন আলী এবং অন্যান্য সামরিক অফিসারদের ক্ষেত্রেও কি তোমাদের এই একই পন্থা কাজ করেছে? -বলল জাবের।

মিঃ ইসহাক এমিল সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল।

পাশে দাঁড়ানো বিন আতীর দিকে চেয়ে জাবের বলল, এখানকার কাজ আপাতত শেষ। একে নিয়ে সেলে রাখ। খেতে দাও। হেড কোয়ার্টার থেকে নির্দেশ পেলে এর ব্যবস্থা করা যাবে। কথা শেষ করে জাবের দ্রুত ঘর থেকে বের হয়ে এল। প্রবেশ করল ওয়ারলেস রুমে। প্রেরক যন্ত্রের কাটা ঘুরিয়ে সে যোগাযোগ করল আলেকজান্দ্রিয়ার সাথে।

-হ্যালো। ৩২১ ইউ, এন, এ?

-হ্যাঁ। ওপার থেকে উত্তর এল।

-কে?

-ইবনে জাবীর।

-শোন, হোটেল প্রিন্স-এর মিস জামিলা ও মিস রায়হানা এবং 'আলী এন্ড ব্রাদারস কোং

-এর মিঃ ফারুকী ও মিস সেলিনাকে অবিলম্বে গ্রেফতার কর। বিমান বন্দর ও সি-পোর্ট বন্ধ। নিশ্চয় ওরা কোথাও পালাতে পারেনি। আমি বলে দিচ্ছি, গ্যারিসন কমান্ডার তোমার সহযোগিতা করবে।

অনুরূপভাবে জাবের মিসরের কয়েকটি জায়গায় সংবাদ পাঠিয়ে অবশেষে যোগাযোগ করল হেড কোয়ার্টারে আহমদ মুসার সঙ্গে। জাবেরের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে। পরিশ্রম আর উত্তেজনার স্বাক্ষর ওগুলো।

জেবেল আল-নুর। আহমদ মুসার অফিস কক্ষ। পায়চারি করছিল আহমদ মুসা। সুন্দর, প্রশস্ত কপাল তাঁর কুঞ্চিত। তীক্ষ্ণ চোখ দু'টি তাঁর মনের গভীরে আত্মস্থ। মনে তাঁর চিন্তার ঝড়। প্রায় তিন সপ্তাহ হয় ইসরাইলের পরিচিত কোড মেসেজ বন্ধ হয়ে গেছে। তার জায়গায় শোনা যাচ্ছে অপরিচিত ও দুর্বোধ্য সংকেত। ঐ দুর্বোধ্য সংকেতের পাঠোদ্ধার করা যায়নি। সাইমুমের সকল প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, সংকেতগুলো ইসরাইলের নতুন কোড মেসেজ। ওরা তাদের পুরাতন কোড মেসেজের পরিবর্তন করেছে। আরব বিশ্বে নতুন করে স্পাই রিং গড়ে তোলারই এটা হয়ত পূর্ব প্রস্তুতি। ইসরাইলের এই নতুন উদ্যোগ বান্‌চাল করে দেবার জন্য ওদের নতুন কোড মেসেজের পাঠোদ্বার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু কিভাবে তা সম্ভব? চিন্তা করে চলে আহমদ মুসা। একটি সহজ পথ আছে ঐ দূর্বোধ্য সংকেতগুলো পাঠোদ্ধার করার এবং তা হল ইসরাইলী কোড মেসেজের ডিসইফার যোগাড় করা। আহমদ মুসার চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো এবং তার চোখে মুখে ফুটে উঠলো স্পষ্ট সিদ্ধান্তের ছাপ। সে গিয়ে চেয়ারে বসে পড়ল। তার কন্ঠে স্বগত উচ্চারিত হল, হ্যা, যেমন করেই হোক ইসরাইলের কবল থেকে তাদের ডিসাইফার যোগাড় করতে হবে। টেবিলে রক্ষিত লাল টেলিফোনটি তুলে নিয়ে আহমদ মুসা রেডিও রুমে কামালকে ডেকে বললো, তেলআবিবে লাইন নিয়ে মাহমুদকে ডাক। আমি আসছি।

কথা শেষ করে টেলিফোনের রিসিভার যথাস্থানে রেখে দিয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে চলল সে রেডিও রুমের দিকে। রেডিও রুমে ঢুকতেই কামাল আহমদ মুসাকে সালাম জানিয়ে বলল, মাহমুদ ভাই আসছে জনাব। আহমদ মুসা ওয়ারলেস সেটের সামনে গিয়ে বসলো। মুহূর্ত কয়েকের মধ্যেই ওপার থেকে মাহমুদের কথা শুনতে পাওয়া গেল। সালাম ও কুশলাদির পর আহমদ মুসা বললো, ইসরাইলিরা কোড বদলিয়েছে লক্ষ্য করেছ?

-জি হ্যাঁ। ওপার থেকে বলল, মাহমুদ।

-কি ভাবছ এ সম্পর্কে?

-আপনার নির্দেশের অপেক্ষায় আছি।

-হ্যাঁ শোন, ওদের নয়া কোডের পাঠোদ্ধার করার সকল প্রচেষ্টা আমাদের ব্যর্থ হয়েছে। ওদের ডিসাইফার ছাড়া এর পাঠোদ্ধার সম্ভব নয়। সুতরাং ওটা তোমাকে যোগাড় করতেই হবে।

-বুঝেছি জনাব।

-যে কোন মুল্যের বিনিময়ে ডিসাইফার আমাদের চাই মাহমুদ। বর্তমান মুহূর্তে এটাই আমাদের জন্য সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

-দোয়া করুন জনাব। আমি এখনি কাজ শুরু করছি।

-আল্লাহ তোমাদের সফল করুন। খোদা হাফেজ।

- খোদা হাফেজ।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে ওয়ারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এলো। সামনের গলিপথটি পেরিয়ে একটি উন্মুক্ত স্থানে এসে দাঁড়াল। কাছেই পাহাড়ের একটি ছোট টিলা। আহমদ মুসা টিলায় উঠে একেবারে মাথায় গিয়ে বসলো। চারিদিকে মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে পাহাড়ের উন্নত চুড়াগুলো। চারদিক নিস্তব্দ-নিঝুম। দক্ষিণ-পূর্বদিকের আকাশের এক জায়গায় উজ্জ্বল হয়ে আছে। আহমদ মুসা বুঝল, ওটা আম্মানের আকাশ। আকাশের দিকে মুখ তুল আহমদ মুসা। জোৎস্নাহীন আকাশের তারাগুলো বেশ ভালো লাগছে দেখতে। এক সময় আদম সুরতের পায়ের নীচে লুব্ধকে এসে আটকে যায় তার চোখ। ওর আলোতে যেন সূর্যের দীপ্তী। সূর্যের মত চোখ বিদ্ধকারী তীক্ষ্নতা ওতে নেই, আছে স্নিগ্ধতা, আছে প্রশান্তি। পলকহীনভাবে আহমদ মুসা চেয়ে থাকে ওর দিকে। লুব্ধক যেন নেমে আসে তার কাছে, একেবারে কাছে। লুব্ধকের দেশে পৌঁছে যায় আহমদ মুসা। লুব্ধকের দেশ থেকে সে উর্ধ্বে চেয়ে দেখল মিট মিটে তারার আলো ভেসে আসছে উপরের উর্ধলোক থেকেও। আহমদ মুসার মনে প্রশ্ন জাগে, ঐ তারার জগতের ওপারে আবার কি আছে? উত্তর এসে তার কানে বাজল, শূন্য, শূন্য, আদি অন্তহীন মহাশূন্য। সম্মুখে পশ্চাতে, ডানে বামে, উপরে নীচে সব দিকেই অন্তহীন মহাশূন্য।

এই মহাশুন্যের নিকট অন্ধকারে তারকা সূর্যগুলো দীপ শিখা জ্বালিয়ে রেখেছে। মহাশুন্যের অন্তহীন ব্যাপকতার মাঝে আহমদ মুসা ভয়ে বিষ্ময়ে অভিভূত হয়ে পড়ে। তার মনে প্রশ্ন জাগে, এই মহা সৃষ্টির স্রষ্টা আল্লাহর শক্তি তাহলে কত বিরাট, কত বড় বিজ্ঞানী তিনি? আহমদ মুসার হৃদয় ও মন নুয়ে পড়ে স্রষ্টার উদ্দেশ্যে। আহমদ মুসা লুব্ধকের জগৎ থেকে দৃষ্টিপাত করে নীচে-বহু নীচে দেখা যায় সূর্যকে। মহাশুন্যের নিকষ কালো বুকে সূর্যকে অতি ক্ষুদ্র এক আলোকবিন্দুর মত মনে হচ্ছে। পৃথিবীর কোন অস্তিত্বই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। আর ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র মানুষ? মহাশুন্যের বিশাল ব্যাপকতার মাঝে মানুষের অস্তিত্ব সত্যই কিছু আছে কি প্রশ্ন জাগে আহমদ মুসার মনে। অথচ এই মানুষই আল্লাহর বড় প্রিয় এবং আশরাফুল মুখলুকাত-সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ। আল্লাহর এ কোন কুদরত। আবেগে উত্তেজনায় দু' চোখ বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়ে আহমদ মুসার। হযরত দাউদ (আঃ)-এর মত তার বিস্ময় বিক্ষুব্ধ চিত্ত থেকে স্বগত উচ্চারিত হয়- হে বিশ্ব নিয়ন্তা প্রভু, মনুষ্য কে যে তুমি তার বিষয় চিন্তা কর? এবং মনুষ্য সন্তানই বা কি যে তুমি তার প্রতি মনোযোগী হও?

আহমদ মুসার সেক্রেটারী আলী বেন শাকের এসে আহমদ মুসার পেছনে দাঁড়াল। অতি ধীর কন্ঠে বলল, অনেক রাত হয়েছে জনাব। খুব শীত পড়ছে। আপনার বিশ্রাম প্রয়োজন।

ধীরে ধীরে মুখ ফিরাল আহমদ মুসা। এই সময় বিরাট এক নক্ষত্র পতন হল। আহমদ মুসার দু'দন্ড বেয়ে ঝরে পড়া অশ্রু চিক চিক করে উঠল। শাকেরের দৃষ্টি এড়াল না তা। সে বিস্মিত কন্ঠে বলল, আপনি কাঁদছেন জনাব?

আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠলো এক টুকরো প্রশান্ত হাসি। সে বলল, এ হারানোর কান্না নয় শাকের, পাওয়ার কান্না। আমার আল্লাহকে আমি এমন নিবিড়ভাবে কোনদিন পাইনি। আকাশের দিকে চেয়ে দেখ, তারায় তারায় শুধু তাঁরই হাতছানি। নিঃসীম মহকাশের আলো আঁধারীর মাঝে তাঁরই শুধুই লুকোচুরি খেলা। বলতে বলতে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

শাকের মন দিয়ে আহমদ মুসার কথা গুলো শুনলো। কিছুই বলল না মুখে। কথা বাড়ানো উচিত নয়। তাদের প্রিয় নেতার বিশ্রাম এ সময় অত্যন্ত

জরুরী। আগে আগে চলল আহমদ মুসা, পিছনে শাকের। আহমদ মুসাকে শয়ন কক্ষে পৌঁছে দিয়ে শাকের তার ঘরের দিকে পা বাড়ালো।

তেলআবিব। মাহমুদ চিন্তান্বিত মুখে ওয়ারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল। মাথায় তার একরাশ চিন্তার জট। ধীরে ধীরে এসে ড্রইং রুমের সোফায় বসল। ইসরাইলীদের হাত থেকে ডিসাইফার উদ্ধার করা চাটটিখানি কথা নয়। মাহমুদ সমস্ত ব্যাপারটা একবার চিন্তা করে দেখল। ডিসাইফার হাতে পেতে হলে অনেকটা পথ তাকে পাড়ি দিতে হবে। প্রথমে তাকে খুঁজে দেখতে হবে, ডিসাইফারের খোঁজ কোন কোন ব্যক্তির কাছে পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়তঃ ঐ সব ব্যক্তির মধ্যে কার কাছ থেকে ডিসাইফারের খবর বের করে নেয়া সহজ হবে, তা নির্ধারণ করতে হবে। তৃতীয়তঃ ডিসাইফার উদ্ধারের ব্যবস্থা করা। মাহমুদ গোটা পরিকল্পনাটিকে আর একবার আগাগোড়া ভেবে দেখল। তারপর প্রথম বিষয়টির প্রতি মনোনিবেশ করল সে। সে চিন্তা করে দেখল, ডিসাইফার কোন গোপন স্থানে রক্ষিত আছে, তা কাদের পক্ষে জানা সম্ভব তাদের মধ্যে প্রধান হলেন-এক, মন্ত্রি; দুই, দেশরক্ষা সেক্রেটারী; তিন, মোসাদ প্রধান এবং চার, সিনবেথ প্রধান ইত্যাদি। এদের মধ্যে দেশরক্ষা মন্ত্রীকে হিসেবের বাইরে রাখা উচিত। এখন অবশিষ্টদের মধ্যে কার নিকট থেকে তথ্য বের করা সহজ হবে? মাহমুদ ভাবল, এটা সুক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার প্রশ্ন। ডসিয়ার আলোচনা ছাড়া এ প্রশ্নের সমাধান অসম্ভব। সোফা ছেড়ে মাহমুদ উঠে দাঁড়াল।

গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করে একটি গোপন সিঁড়িপথ বেয়ে সে প্রবেশ করল ভূ-গর্ভস্থ একটি কক্ষে। রেকর্ড রুম। মাহমুদ ডসিয়ার সেকশনে গিয়ে বসল। টেনে নিল 'সিনবেথ' প্রধানের ডসিয়ার ফাইল। গভীর মনোযাগ নিবিষ্ট করে সে ফাইলটিতে। ফাইল শেষ করে হাতে তুলে নিল মোসাদ প্রধানের ডসিয়ার। শেষ করে ওটাও রেখে দিল সে ফাইল কেবিনে। দেশ রক্ষা সেক্রেটারী এরহান শার্লটকের কোন ডসিয়ার সাইমুমের এ স্থানীয় রেকর্ড রুমে নেই। এরহান শার্লটক

স্বরাষ্ট্র বিভাগ থেকে সদ্য আগত এবং স্বরাষ্ট্র বিভাগেও তার চাকুরির মেয়াদ বেশী দিনের নয়। হয়তো এ কারণেই অপ্রয়োজনীয় বিবেচনায় তার ডসিয়ারই তৈরি হয়নি। সিনবেথ প্রধানের ডসিয়ার থেকে তার যে চরিত্র পরিচয় পাওয়া গেল তা হল তিনি ঠান্ডা মাথা, নির্লিপ্ত মেজাজ, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি কর্তব্যপরায়ণ ও বিশ্বাসী। মাহমুদ ধীরে ধীরে মাথা নাড়ল, এ বড় শক্ত চীজ। এ ভাঙ্গবে কিন্তু মচকাবে না। মোসাদ প্রধানও মোটামুটি একই চরিত্রের। তবে সিনবেথ প্রধান অপেক্ষা অধিকতর কূটবুদ্ধি ও হিংস্র। তাঁর চরিত্রের বড় একটি দুর্বল দিক হলো, নারীর প্রতি মাত্রাতিরিক্ত মোহ। ঘৃণায় মাহমুদের মুখ কুঞ্চিত হলো। সাইমুম এ ধরনের অস্ত্র প্রয়োগকে ঘৃণা করে। উঠে দাঁড়াল মাহমুদ। বেরিয়ে এল রেকর্ড রুম থেকে। সমস্যার সমাধান হল না। এরহান শার্লটক সম্পর্কে জানা দরকার। এমিলয়ার কাছ থেকে জানা যাবে? হঠাৎ একটি নাম তার স্মৃতির আকাশে ঝিলিক দিয়ে গেল, 'এমিলিয়া'! নামটি স্মরণ হওয়ার সাথে সাথে মাহমুদের গোটা দেহের অণুতে-পরমাণুতে বিদ্যুৎ শিহরণ খেলে গেল। আনন্দের শিহরণ খেলে গেল দেহের প্রতিটি শিরা উপশিরায়। মাহমদ অবাক হল এমিলিয়া তার দেহের অণুতে-পরমাণুতে এমনিভাবে মিশে গেছে?

হাঁ, এমিলিয়ার কাছে এরহান শার্লটক সম্পর্কে জানা যেতে পারে, কিংবা জানার ব্যাপারে প্রয়োজনীয় সাহায্যও সে করতে পারে। মাহমুদ সোফায় এসে বসল। হাত ঘড়ির দিকে চেয়ে দেখল, রাত ১টা। এমিলিয়া ঘুমিয়ে আছে। বেচারীকে এ রাতে ঘুম থেকে জাগানো কি ঠিক হবে? কিন্তু এছাড়া উপায় কি? ডিসাইফারের ব্যাপারে কালকের মধ্যে একটা সুরাহা করা তার চাই। মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। পা বাড়াল ড্রেসিং রুমের দিকে।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে মাহমুদ বেরিয়ে এল। পরনে কাল ট্রাউজারের উপর লম্বা কাল ওভারকোট। মাথায় ফেলট হ্যাট। একটু দুর থেকে দেখলে মনে হবে রাত্রিকালের টহলদারি ইসরাইলী পুলিশ।

রাত দুপুরের তেলআবিব। জনবিরল রাস্তা। দু'একটি গাড়ীর আনা গোনা চলছে। মাহমুদের গাড়ী এসে একটি পাবলিক টেলিফোন বুথের সামনে দাঁড়াল। টেলিফোন বুথে প্রবেশ করে একটি নম্বরে সে ডায়াল করল। মুখে এক টুকরো

হাসি। ও প্রান্তে টেলিফোন বেজে চলেছে। কিন্তু নো রিপ্লাই। মাহমুদ নাছোড় বান্দা। বেজেই চলছে টেলিফোন। কিছুক্ষণ পর ও প্রান্ত থেকে রিসিভার ওঠানোর শব্দ শোনা গেল। তারপর ভেসে এল একটি শব্দ হ্যালো---। নিদ্রাজড়িত কণ্ঠ। বলছে এমিলিয়া। নিশ্চিত হয়ে মাহমুদ রিসিভার রেখে দিল কোন উত্তর না দিয়েই। রাগে বিরক্তিতে এমিলিয়ার সুন্দর মুখটি এখন কেমন হয়েছে, মানস চক্ষেই আঁচ করত পারল মাহমুদ। কিন্তু বেচারীকে এভাবে না জাগিয়ে উপায় ছিল না।

এমিলিয়ার বাড়ী থেকে একটু দুরে একটি অন্ধকার গলিতে গাড়ী পার্ক করে রেখে এমিলিয়াদের বাড়ীর পেছন এসে দাঁড়াল মাহমুদ। তারপর পাচিল টপকে ভিতরে বাগানে গিয়ে পড়ল সে। একটুক্ষণ দাঁড়িয়ে চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে মাহমুদ সামনে পা বাড়াল। গিয়ে দাঁড়াল এমিলিয়া যে ঘরে থাকত, ঠিক তার নীচে। উপরে চেয়ে দেখল, এমিলিয়ার দু'টি জানালাই বন্ধ। মাহমুদ মত পরিবর্তন করল, না আজ জানালা দিয়ে নয় দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করবে। গভীর রাত। কেউ জেগে নেই। পকেট থেকে সিল্কের কর্ড বের করে ছুড়ে মারল সে ছাদে। অভ্রান্ত লক্ষ্য। কর্ডের মাথার হুকটি বেঁধে গেল ছাদের সাইড ওয়ালে। মাহমুদ কর্ড বেয়ে উঠে গেল ছাদে। মাহমুদ খুশি হল, ছাদ থেকে নীচে নামবার সিঁড়ির দরজা খোলা আছে। সে অতি সন্তর্পণে সিঁড়ি বেয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়াল। চারতলার বারান্দা। চারতলার অংশে মোট তিনটি ঘর। একটি এমিলিয়ার বেডরুম, অন্যটি ড্রয়িংরুম এবং তৃতীয়টিতে থাকে এমিলিয়ার খাস পরিচারিকা সোনি। সর্বদক্ষিণের ঘরটি এমিলিয়ার শয়নকক্ষ। শয়নকক্ষের দরজায় গিয়ে মাহমুদ দাঁড়াল। হাঁটুর নীচ পর্যন্ত নামানো মাহমুদের ওভারকোট। ফেল্ট হ্যাট মুখের অর্ধাংশ ঢেকে রেখেছে। মাহমুদ ধীরে ধীরে 'নক' করল দরজায়। একবার-দুইবার-তিনবার। তুতীয়বারের পর এমিলিয়ার কণ্ঠ শোনা গেল। 'কে?' সোনি? মাহমুদ আবার সামান্য বিরতিতে টোকা দিল। আবার এমিলিয়ার কণ্ঠঃ কে? এবার তার কন্ঠে যেন উদ্বেগ। মাত্র কয়েক মুহুর্ত, তারপর ধীরে ধীরে দরজা খুলে গেল। ভিতরে হালকা নিল আলো। উদ্যত রিভলভার হাতে দাঁড়িয়ে আছে এমিলিয়া। রিভলভারের চকচকে নল মাহমুদের বুক লক্ষ্য করে সাপের জিহ্বার মত যেন

লকলক করছে। ট্রিগারে রাখা এমিলিয়ার তর্জনিটি উত্তেজনায় কাঁপছে, যে কোন মুহুর্তে ট্রিগারে চাপ দিয়ে বসবে। চিৎকার করে এমিলিয়া কিছু বলতে যাচ্ছিল। মাহমুদ তর্জনিটি ঠোটে ঠেকিয়ে চুপ করার ইংগিত করল এবং পর মুহূর্তেই মাথা থেকে ফেল্ট হ্যাট ছুড়ে ফেলে দিল মাহমুদ। মাহমুদকে চিনতে পেরেই এমিলিয়া রিভলভার ছুড়ে ফেলে দিয়ে দু'হাতে মুখ ঢেকে বসে পড়ল। মাহমুদ একটু এগিয়ে এমিলিয়াকে বলল, ভয় পেয়েছ? এমিলিয়া মুখ তুলল। তার মুখে আনন্দ ও বিস্ময় দুটোই। বলল, যদি গুলী করতাম।

মাহমুদ ঘরে প্রবেশ করে বলল, কি হত আর, এভাবে মৃত্যু থাকলে মরে যেতাম।।

এমিলিয়া দরজাটি বন্ধ করে দিয়ে এসে মাহমুদের ওভারকোট-এর বোতাম খুলতে খুলতে বলল, ইস! তাহলে কি হত?

-হত আর কি, ডেভিট বেন গুরিয়ানের নাতনী তুমি। ভাবতে, এক দুস্বপ্ন দেখছিলে।

-না, আমি শুধু ডেভিড বেনগুরিয়ানের নাতনী নই। আমি আমি.........। কথা শেষ না করেই থামল, এমিলিয়া। মুখ তার আরক্ত হয়ে উঠেছে। বলল, ঐ রিভলভারের একটি গুলি আমার বুকেও ঢুকত।

-কিন্তু নিয়ম তো এ নয় এমি!

-কেন?

-তোমার জীবনের মালিক তুমি নও, তোমার স্রষ্টা আল্লাহ। সুতরাং ইচ্ছা করলেই তুমি তোমার জীবনের উপর স্বেচ্ছাচার চালাতে পার না। -এ অধিকার তোমার নেই।

-কিন্তু ঐ দুর্বহ বেদনার ভার বহন করা......।

-তবু তাই করতে হয়। শত দুঃখ বেদনার পারাবার পাড়ি দিয়ে আল্লাহর বান্দা হিসেবে তুমি তোমার জীবনকে সার্থক করে তুলবে-এটাই জীবনের স্বাভাবিক দাবী।

-বড় কঠিন এটা।

-কঠিন, কিন্তু স্বাভাবিক।

মাহমুদের গা থেকে ওভারকোট খুলে নিয়ে রেখে দিয়ে এমিলিয়া বলল, একটু বিশ্রাম নাও। তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। বলে সে মাহমুদকে ইজি চেয়ার এগিয়ে দিল।

মাহমুদ বলল, তুমিও বস।

-বসছি। বলল এমি। কিন্তু সে বসল না। ইজি চেয়ারের পিছনে দাড়াল এমিলিয়া। তার হাতের আঙ্গুলগুলো মাহমুদের জামার কলার নিয়ে খেলা করতে লাগল। ফিস্ ফিস্ করে এক সময় বলল, রাতে ক'ঘন্টা ঘুমাও।

-কোনদিন সারারাত, কোনদিন এক ঘন্টাও না।

-এমন করলে শরীর ভাল থাকে বুঝি?

-না থাকুক। অসুখ করলে শুয়ে থাকা যায়, পরিচর্যা পাওয়া যায়।

-কে পরিচর্যা করে?

-অসুখ করেনি কোনদিন। সামান্য যা করেছে আপন পরিচর্যায় তা সেরে গেছে। তাই বলতে পারিনে।

-যদি হয়?

-আমার সহকর্মীরা আছে।

-কেন, আমাকে ডাকবে না?

-ডাকলে তুমি যাবে?

-তোমার কি মনে হয়?

মাহমুদ কোন জবাব দিল না। পরে ধীরে ধীরে বলল, তোমাকে ডাকবার দিন এখনো আসেনি এমি। যেদিন ফিলিস্তিনী মজলুম মুসলিম ভাই বোনেরা তাদের স্বদেশ ভূমি ও তাদের বাড়ীঘর ফিরে পাবে, যেদিন তারা হারোনোর বেদনা ভুলে গিয়ে পাওয়ার আনন্দে উদ্বেল হয়ে উঠবে, সেইদিন আমার সংসারের রাণী সেজে যাবে আমার ঘরে। জ্বলবে আমার আঁধার ঘরে আলো। হাসি আনন্দে মুখর করে তুলবে আমার বোবা গৃহাঙ্গন। মাহমুদের কণ্ঠ ভারি হয়ে উঠল যেন ক্রমে।

-সেদিন কতদুরে মাহমুদ?

-আমি জানি না এমি।

অনেক্ষণ ধরে কেউ কোন কথা বলল না। প্রথমে নিরবতা ভাঙ্গল এমিলিয়া। বলল, এতরাতে তোমাকে কি খাওয়াই বলত?

-না, তোমাকে ওসব পাগলামি করতে দেব না। এটা সময় নয় খাওয়ার।

-ফল মিষ্টি খেতে দোষ নেই। মাত্র দু'মিনিট। আমি আসছি। একটু পর রেফ্রিজারেটর থেকে আঙ্গুর, কেক প্রভৃতি কয়েক ধরনের খাবার এনে এমিলিয়া হাযির করল। মাহমুদ এমিলিয়াকেও বসাল। খেতে খেতে মাহমুদ বলল, খুব ভয় পেয়েছিলে, না?

মুখে পুরে দেয়া কেকের টুকরা ভাল করে গিলে নিয়ে এমিলিয়া বলল, ঐ টেলিফোনটাও তাহলে তুমিই করেছিলে না?

মাহমুদ হাসতে লাগল।

এমিলিয়া বলল-ঐ ভূতুড়ে টেলিফোন পাওয়ার পরই রাত দুপুরে যদি দরজায় টোকা শোনা যায় এবং জিজ্ঞেস করেও তার কাছ থেকে যদি জবাব না পাওয়া যায়, আর দরজা খুলে যদি দেখা যায় ফেল্ট হ্যাটে মুখ ঢাকা কাল আলখেল্লা মোড়া এক মনুষ্যমুর্তি, তাহলে ভয় করবে না বুঝি? একটু থেমে সে আবার বলল, টেলিফোন ছেড়ে দিয়েছিলে কেন? বলে আসলেই পারতে।

-হ্যাঁ তোমাকে টেলিফোনে বলে-কয়ে আসি, আর তোমাদের টিকটিকি মহাশয়রা আমার অভ্যর্থনায় তোমাদের বাড়ীর গেটে দাঁড়িয়ে থাকুক।

-তা'হলে টেলিফোন করলে কেন?

-তোমার ঘুম ভাঙ্গানোর জন্য, এখানে এসে তো ডাকতে পারতাম না।

-উহ! তোমার এত বুদ্ধি।

-তোমার সাবধানতা দেখে আমি খুশী হয়েছি এমি, ভবিষ্যতেও তুমি এমনি সাবধান থেকো।

খাওয়া শেষ হয়ে গেল। মাহমুদ ঘড়ি দেখল, রাত প্রায় দু'টা। প্লেটগুলো নিয়ে উঠে দাঁড়াল এমি। মাহমুদ বলল, তোমার সাথে জরুরী কিছু কথা আছে।

এমি বলল-আসছি।

এমি প্লেটগুলো রেখে এসে সামনের চেয়ারটিতে বসে বলল-বল।

মাহমুদ তার ইজি চেয়ারটি টেনে নিয়ে এমিলিয়ার আরও কাছে গিয়ে বসল। এমিলিয়ার চোখে চোখ রেখে অতি নীচু গলায় বলল-তোমার কিছু সহযোগিতা চাই এমি।

এমিলিয়ার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, বল, আমি রাজি।

-দেশরক্ষা সেক্রেটারী এরহান শার্লটককে তুমি চেন?

-চিনি।

-কেমন চেন?

-ভালভাবে চিনি। ওর মেয়ে, আমার ক্লাশমেট। ওদের বাসায় মাঝে মাঝে যাই। এরহান চাচাজী আমাকে খুব স্নেহ করেন।

এরহান শার্লটকের মেজাজ ও চরিত্র সম্পর্কে কিছু বলতে পার?

-সৎ, সচ্চরিত্র, কর্তব্যপরায়ণ ও বিশ্বাসী কর্মচারী বলে উনার খুব সুনাম আছে। আর মেজাজ-মেজাজ একটু খিট খিটে ধরনের বলেই আমার মনে হয়।

-কেন?

-সামান্য কারণেও ওঁকে মাঝে মাঝে আমি খুব বেশী রেগে যেতে দেখিছি।

-যেমন?

-কারও কোথাও থেকে আসতে একটু দেরী হওয়া, ইত্যাদি।

মাহমুদ আর কিছু বলল না। পাওয়া সুত্রগুলো নিয়ে চিন্তার অতলে ডুব দিল সে। চোখ দু'টি তার বুজে গেল। যা সে জানতে চেয়েছিল, তা সে পেয়েছে। শার্লটকের এ খিটখিটে মেজাজের অর্থ তাঁর প্রতিরোধ শক্তি কম। এ ধরনের লোকের কাছ থেকে ভয় দেখিয়ে কিংবা চাপ দিয়ে কথা আদায় করা যায়। ডিসাইফারের খবর শার্লটকের কাছ থেকেই যোগাড় করতে হবে। মাহমুদ চোখ খুলল। দেখল এমিলিয়া পলকহীন দৃষ্টিতে তার দিকে তাকিয়ে আছে। বলল মাহমুদ ভাবছিলাম এমি।

-কি ভাবছিলে?

-তোমার শার্লটক চাচাজির মুখ থেকে আমাদের একটা কথা বের করে নিতে হবে, তা সম্ভব কি না তাই চিন্তা করছিলাম।

-কি কথা জানতে পারি কি? মাফ করো, আমি নিছক জানার আগ্রহ নিয়ে এ কথা বলছি না, যদি কোন সাহায্য করতে পারি সেই উদ্দেশ্যে।

-আমি তা বুঝতে পেরেছি এমি। একটু থামল মাহমুদ।

তারপর আবার বলল, ডিসাইফার চিন?

-কোড এক্সপ্লানেশন যাতে লেখা সেই বই কিংবা কোড মেসেজের ব্যাখ্যাকারী বই তো?

-হ্যাঁ, ঠিক চিনেছ। দিন পনের হয় ইসরাইল তাদের পুরনো কোডের পরিবর্তন করে নতুন কোডের প্রবর্তন করেছে। এই নতুন কোডের যে ডিসাইফার বুক ইসরাইলের আছে সেটা আমাদের প্রয়োজন। এই ডিসাইফার কোথায় রাখা হয়েছে, সেটাই আমরা জানতে চাই তোমার চাচাজানের কাছ থেকে।

-তিনি কি বলবেন?

-সহজে কি বলবেন? বলতে বাধ্য হবেন।

-ডিসাইফারের কিছু সন্ধান বোধ হয় আমি জানি।

-জান তুমি? মাহমুদের কন্ঠে ঝরে পড়ল একরাশ বিস্ময়।

-হাঁ, আমি জানি।

মাহমুদের বিস্ময় তখনও কাটেনি। মুহূর্ত কয়েক পর সে ধীর কন্ঠে বলল, কি জান, কতটুকু জান এমি?

-না বলব না। মুখ টিপে হাসল এমিলিয়া।

-তা হলে তোমাকেই হাইজাক করতে হয় দেখছি। মাহমুদও হাসল।

-আমি রাজি। অন্তত......

-অন্তত আমার আস্তানাটা দেখতে পারবে, তাইতো? হেসে বলল মাহমুদ।

দূরের কোন পেটা ঘড়িতে রাত দু'টো বেজে গেল। মাহমুদ সচকিতভাবে ঘড়ির দিকে চাইল। বলল-না এমি আর অপেক্ষা করতে পারি না, তোমার কষ্ট হচ্ছে।

-কষ্ট? আমার হচ্ছে? একটু থামল এমিলিয়া। বেদনার্ত হয়ে উঠল তার দু'টি চোখ। বলল সে, যার অপেক্ষায় হৃদয়-মন ব্যাকুল হয়ে থাকে, তাকে পাশে পাওয়ার সৌভাগ্য কষ্টকরই বটে।

-তা নয়, আমি বলছিলাম.......

মাহমুদের কথা কেড়ে নিয়ে এমিলিয়া বলল, না আর কোন কথা নয়। তোমার সময় নষ্ট হচ্ছে। বলে সে মাহমুদের সামনে উঠে এসে তার পিছনে দাঁড়াল। দু'টি কনুই মাহমুদের ইজি চেয়ারে ঠেস দিল। এমিলিয়ার তপ্ত নিঃশ্বাস মাহমুদ স্পষ্ট অনুভব করতে পারছিল তার কানে-গন্ডে।

মাহমুদ কিছু বলতে যাচ্ছিল। এমিলিয়া তাকে বাধা দিয়ে বলল, শুন, দেশরক্ষা সেক্রেটারী শার্লটক চাচাজানের মেয়ে মারিয়া স্মার্থা আমার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। ও "মোসাদ"-এ ট্রেনিং নিচ্ছে। ওর কাছেই আমি ডিসাইফারের একটি কপি গত পরশু দেখেছি। বইটি আমাকে দেখিয়ে সে বলেছে, অতি গোপনীয় বইটি বিশেষ নির্দেশক্রমে সে মাত্র কয়েকদিনের জন্য আনতে পেরেছে। থামল এমিলিয়া।

মাহমুদ এমিলিয়ার একটি হাত ধরে টেনে নিয়ে পাশে বসাল। বলল, বইটি আমার চাই এমি এবং কালই।

-আমাকে চুরি করতে বলছ বইটি? হাসল এমিলিয়া। মাহমুদ বলল, না তোমার বান্ধবীকে আমরা বিপদে ফেলতে চাই না। তাছাড়া চুরি করলে ওরা জানতে পারবে, তাতে আমাদের খুব বেশী লাভ হবে না।

-তা হলে......?

-বইটির পৃষ্ঠা সংখ্যা কত হতে পারে?

-দেড়শ'র বেশী হবে না।

-আচ্ছা, তুমি যদি ওখানে গিয়ে বইটি দেখ বা পড়, তাহলে তোমার বান্ধবী আপত্তি করবে?

-না।

মাহমুদ মুহূর্ত কয়েক ভাবল। তারপর পকেট থেকে ক্ষুদ্র সিগারেট লাইটার বের করে এমিলিয়ার হাতে দিল।

এমিলিয়া বলল, এ সিগারেট লাইটার দিয়ে কি হবে?

-সিগারেট লাইটার নয়। এটা একটা ক্যামেরা। ঐ যে মাথায় ক্ষুদ্র সাদা সুইচ দেখছ, ওটাতে যতবার চাপ দিবে, উঠবে একটি করে ফটো।

-বুঝেছি, বই-এর প্রতিটি পাতার ফটো নিব আমি। হাসল এমিলিয়া।

-ঠিক, তোমার বান্ধবীর অলক্ষ্যে করতে হবে এ কাজ। পারবে না?

-তোমার নির্দেশ হলে, এর চেয়েও কঠিন কাজ আমি করব। শান্ত ও দৃঢ় কণ্ঠ এমিলিয়ার।

-নির্দেশ নয় এমি, এটা আমার অনুরোধ। সকলের তরফ থেকে আমার এ অনুরোধ। আর জান, এটা অন্যায়ও নয় এমি। ফিলিস্তিনের প্রকৃত ইহুদি বাসিন্দাদের বিরুদ্ধে আমাদের কোন ক্ষোভ নেই, অভিযোগ নেই। বাস্তুহারা মুসলিম ফিলিস্তিনিরা তাদের হারানো রাষ্ট্র ফিরে পেতে চায়, যেখানে নাগরিক হিসেবে ইহুদিদেরও থাকবে সমান অধিকার।

-আমি জানি মাহমুদ। বল আমাকে কি করতে হবে।

-বলছি শুন, এই একটি লাইটার ক্যামেরায় যা রীল আছে, তাতে ৫০টি ফটো উঠবে। এ ধরনের আরও দু'টি ক্যামেরা আমরা তোমাকে পৌঁছাব। এখন বল তোমার পরিকল্পনা-কিভাবে এগুবে।

-তুমি যেমন বলবে।

-আমি তোমার মূল কর্তব্য বলে দিয়েছি। এখন তোমার নিজের বুদ্ধির উপর নির্ভর করে কাজ করতে হবে। কোন অবস্তাতেই তোমাকে ধরা পড়া চলবে না। একান্তই যদি কোন প্রতিকূল পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তাহলে লাইটার ক্যামেরার নীচের তলায় একটি লাল সুইচ আছে, ওটাতে চাপ দিয়ে গোটা ক্যামেরাটাই জ্বালিয়ে দিবে।

-বুঝেছি।

-তুমি যে ক্যামেরাটি পেলে ওটা ১নম্বর। ২ এবং ৩ নম্বর কাল পাবে। ক্রমিক হিসেবে ব্যবহার করবে। আচ্ছা, কাল কখন যেতে পারবে স্মার্থাদের ওখান?

-সকাল ন'টায় যাব।

-সকাল ঠিক আটটায় তোমাদের বাড়ীর গেটে ফুল-বিক্রেতা আসবে। তার কাছে থাকবে সুন্দর সুন্দর ফুলের তোড়া। তুমি দু'টি তোড়া কিনে নিবে। তারপর-তারপর কি করবে বলত? হেসে বলল মাহমুদ।

-ফুলের তোড়া ভেঙ্গে ক্যামেরা দু'টো বের করে নেবো। কিন্তু ফুলের তোড়া কি ভাঙ্গতে ইচ্ছে করবে? এমিলিয়া হাসল।

-ভাঙ্গতে হবে না। মাঝখানের মাত্র একটি ফুল তুললেই ক্যামেরা পেয়ে যাবে। থামল মাহমুদ। তারপর বলল, আবার তুমি কখন ফিরতে পারবে সেখান থেকে?

-ঠিক করে তো বলা কঠিন।

-বিকেলের আগে তো নিশ্চয়ই।

-তাহবে।

-কালকেই কিন্তু আমাদের ক্যামেরা ফিরে চাই।

-তুমি আসবে নিতে?

-আসতে বল?

-বলতে কি তা পারব? ব্যক্তিগত ভালো লাগা-না লাগার মূল্য কি কিছু আছে? এমিলিয়ার কণ্ঠ ভারী শোনাল।

মাহমুদ এমিলিয়ার চোখে চোখ রাখল। এমিলিয়া চোখ নামিয়ে নিলে। মৃদু হাসল মাহমুদ। তারপর বলল, জাতীয় কর্তব্য যেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে, ব্যক্তি সত্ত্বা সেখানে অবশ্যই গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু সম্পূর্ণভাবে তা যে মুছে যায় না- একথা আজ আমি মর্মে মর্মে অনুভব করছি। জাতীয় দায়িত্বের শত কাজের ভীড়েও আমি তোমার কথা ভাবি, ভাবতে ভাল লাগে। যখন তোমার কাছে আসার প্রশ্ন ওঠে, তখন মন নেচে ওঠে আনন্দে। আমার এ ব্যক্তিগত ভালো লাগাকে মূল্য না দিয়ে পারছি কই এমি?

-ব্যক্তিসত্ত্বার এ দাবী কি অন্যায়?

-ব্যক্তি ও জাতীয় সত্ত্বা উভয়েরই সমান মর্যাদা। একটির স্বার্থে অপরটিকে অস্বীকার করা যায় না। আমার বিশ্বাস, ব্যক্তি সত্ত্বার দাবী যতক্ষণ জাতীয় নীতি-নিয়মের সীমা লংঘন না করছে, ততক্ষণ সে দাবী অন্যায় নয়। থামল মাহমুদ।

এমিলিয়া নিরব। মাহমুদ বলল, কথা বলছ না যে।

-খুব ভয় করে আমার, হয়ত কত অন্যায় করে যাচ্ছি। দেখ ছোট বেলা থেকে নিজের ব্যক্তিগত ভালো লাগা না লাগাকে বড় করে দেখার শিক্ষা পেয়েছি। তাই ভুল-ভ্রান্তিকে ক্ষমা করো।

-তুমি ইতিমধ্যে অনেক পরিবর্তন এনেছ। তুমি শুধু আমাকে নয়, আমাদের সবাইকেই বিস্মিত করেছ। থামল মাহমুদ। বলল আবার, আগামী সন্ধ্যা ৭ টায় অক্সফোর্ড বুক ফাউন্ডেশন থেকে কিছু বই নিয়ে একজন লোক এসে তোমাদের গেটে দাঁড়াবে এবং তুমি কিছু বই চেয়েছ বলে তোমাকে সংবাদ দিতে বলবে। তুমি তাকে ডেকে নেবে। ক্যামেরা তিনটি একটি থ্রিক্যাসল সিগারেট প্যাকেটে পুরে রাখবে। বুক ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি এসে বসার পর সেও একটি থ্রিক্যাসল সিগারেটের প্যাকেট টেবিলে রাখবে। সিগারেট-প্যাকেটের এক কোণে আমার হস্তাক্ষর থাকবে-CM. থ্রিক্যাসল সিগারেট প্যাকেটে যদি আমার হস্তাক্ষর দেখতে পাও, তাহলে লোকটিকে খাঁটি জানবে এবং বইপত্র দেখার ফাঁকে ঐ প্যাকেটটি তুলে নিয়ে তোমারটি রেখে দিবে।

-তোমার হস্তাক্ষর CM-এর অর্থ কি?

-কর্ণেল মাহমুদ।

-আর ইউ কর্ণেল। বিস্ময়ে এমিলিয়া চোখ দু'টি বড় বড় করল।

-কেন বিশ্বাস হয় না?

-তুমি রীতিমত তা'হলে সেনাবাহিনীর লোক? কিন্তু ....

-কিন্তু কোন্ সেনাবাহিনীর এই তো? হাসল মাহমুদ। একটু থেমে আবার বলল, থাক ওসব কথা আজ। এবার উঠি এমি। বলে উঠে দাঁড়াল মাহমুদ।

-যাচ্ছ?

-হ্যাঁ, যাই।

-আবার কবে দেখা হবে?

-আল্লাহ জানেন।

মাহমুদ ঘর থেকে বেরিয়ে ছাদে উঠে এল। সাথে সাথে উঠে এল। এমিলিয়াও ছাদের কার্ণিশ থেকে সিল্কের কর্ড ঝুলছে। মাহমুদ গিয়ে দাঁড়াল সেখানে।

এমিলিয়া এসে দাঁড়াল মাহমুদের পাশে একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে। বলল, একটা কথা বলব?

-অন্তত তোমার টেলিফোন নম্বরটুকু পেতে পারি না?

মাহমুদ মুহূর্ত কয়েক চিন্তা করে বলল, আমার অপারগতার কথা তো তুমি জান এমি।

-আমি কথা দিচ্ছি, আমি কখনও টেলিফোন করব না। শুধু আমি নিশ্চিন্ত থাকতে চাই যে, প্রয়োজন হলে তোমার সাথে যোগাযোগ করতে পারব।

-তোমার অনুরোধ রক্ষা করতে না পারা আমার জন্য বড় কষ্টের এমি। কিন্তু আমি অপারগ। তুমি সব জান। আমাকে ক্ষমা করো তুমি।

এমিলিয়া মুখ নীচু করে দাঁড়িয়েছিল। কোন কথা বলল না। তেমনি মুখ নিচু করে দাঁড়িয়ে রইল।

মাহমুদ ফিরে এমিলিয়ার মুখোমুখি দাঁড়াল। ওর চোখে অশ্রু। বোধ হয় অশ্রু গোপন করার জন্য এমিলিয়া দু'হাতে মুখ ঢাকল।

ভাব্ছিল মাহমুদ। ভাবছিল এমিলিয়াকে টেলিফোন নম্বর দেয়া যায় কি না। কিন্তু ভেবে দেখল, এমিলিয়াকে সকল সন্দেহের উর্ধে হলেও এ ধরনের কাজ হবে সম্পূর্ণ নীতি-বিরুদ্ধে। প্রিয়তমার চোখের পানিতে সে তার নীতি ও দায়িত্ববোধ বিসর্জ্জন দিতে পারে না। মাহমুদ বলল, বড্ড খারাপ লাগছে এমি। বিদায় বেলায় আজ তোমার চোখে অশ্রু দেখে গেলাম।

এমিলিয়া একটু হেঁট হয়ে রুমালে দু'টি চোখ মুছে নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াল। কোন কথা বলল না।

মাহমুদ বলল, আসি এমি কথা দিয়ে যাচ্ছি, এরপর বাইরের কোন টেলিফোন থেকে মাঝে মাঝে তোমার সাথে কথা বলব। বলে মাহমুদ দোলায়মান কর্ডের দিকে এগুলো।

এমিলিয়া মাহমুদের একটি হাত চেপে ধরে বলল, কষ্ট নিও না, আমার দুর্বলতাকে ক্ষমা করো।

মাহমুদ ফিরে দাঁড়াল। এমিলিয়ার আনত মুখটিকে তুলে ধরে বলল, তাহলে হাসতে হবে। বলে হাসতে লাগল।

-জোর করে বুঝি হাসাবে তুমি। হেসে ফেলল এমিলিয়াও।

-কাঁদাবে যে হাসাবে তো সেই। আসি। খোদা করুন আগামীকালের অপারেশনে তুমি সফল হও। খোদা হাফেজ।

-খোদা হাফেজ। বলল এমিলিয়া।

মাহমুদ সিল্কের কর্ড ধরে ঝুলে পড়ল।

সৌদি আরবের দুর্গম মরুদ্যান আল-আসির। রাত দশটা। চারিদিকের দিগন্ত প্রসারিত বালির সমুদ্রে একটি ক্ষুদ্র তিলকের মত ঘুমিয়ে আছে আল-আসির। খেজুর কুঞ্জ আচ্ছাদিত আল-আসিরের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুক চিরে একটি লাল আলো স্থিরভাবে জ্বলছে। ভয় করে আলোর দিকে চাইলে। যেন কাল রাত্রির বিশাল দেহ রক্তচক্ষু তুলে কাউকে শাসাচ্ছে। আল আসিরের পশ্চিম আকাশে হঠাৎ ইঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল। শব্দ নিকটতর হলো-বোঝা গেল হেলিকপ্টার লাল আলোর উপরে এসে সার্চ লাইটের আলো একবার নীচে নিক্ষেপ করল। সার্চ লাইটের আলোয় একটি দীর্ঘ রানওয়ে স্পট হয়ে উঠল। নিভে গেল সার্চ লাইট। ল্যান্ড করল হেলিকপ্টারটি। মাত্র ২৫ মিনিটের মধ্যে আরও তিনটি হেলিকপ্টার ল্যান্ড করল আল-আসিরে।

আল-আসিরের মাঝখানে খেজুর কুঞ্জে ঢাকা একটি কাল পাথরের বাড়ী। বায়তুল-আমিন-শাহ সউদের একটি অবকাশ নীড়। পারস্য উপসাগরের হিমেল বাতাস সিক্ত এই নীরব-নিঝুম মরুদ্যানে শাহ সউদ মাঝে মাঝে অবকাশ যাপন করতে আসেন। শাহ ইবনে সউদের অবকাশ নীড় এই বায়তুল আমিনেই আজ সংযুক্ত আরব কমান্ড ও আরব সুপ্রীম সিকিউরিটি কাউন্সিলের বৈঠক বসেছে। ফিলিস্তিন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্বান্ত নেয়া হবে আজ এখানে। অতি গোপন এ বৈঠক। আমেরিকা, রাশিয়া ও বৃটেনের শ্যেনদৃষ্টিকে ফাঁকি দিয়ে আজ এখানে একত্রিত হয়েছেন বাদশাহ সউদ, মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার রশিদ, জর্দানের বাদশাহ আবুল হিশাম, লিবিয়ার প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল, মরক্কোর বাদশাহ হাসান শরীফ, সুদানের প্রেসিডেন্ট ফারুক আল নিমেরী, আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট আবু জাফর আবেদীন, সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-সাল্লাল এবং সংযুক্ত আরব কমান্ডের অধিনায়ক আবুল আমর আবদুল্লাহ। আর এসেছে সাইমুমের নেতা আহমদ মুসা।

কাল পাথুরে বাড়ীটির অভ্যন্তরে একটি সুসজ্জিত হলঘর। একটি গোল টেবিলের চারদিকে বসেছেন আরব নেতাগণ। সভাপতির আসনে বসেছেন শাহ সউদ। শাহ সউদের ডানপাশে বসেছেন সাইমুম প্রধান আহমদ মুসা, আর বামপাশে আনোয়ার রশিদ। শাহ সউদের সামনে একগাদা কাগজ। প্রথম নীরবতা ভঙ্গ করে কথা বললেন, শাহ সউদ। গম্ভীর কন্ঠ ধ্বনিত হলো তার, 'সম্মানিত ভ্রাতৃবৃন্দ, আমরা এক অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে সিদ্বান্ত নেবার জন্য এখানে সমবেত হয়েছি। বায়তুল মোকাদ্দাস এবং ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আমরা কোন পথ ধরব? সে পথ কি আমাদের সম্মিলিত শক্তি প্রয়োগের পথ? কিংবা বৃহৎ শক্তিবর্গের উপর চাপ সৃষ্টির পথ? অথবা কৌশলে ফিলিস্তিনে স্বয়ংক্রিয় কোন বিপ্লব সংঘটনের পথ? আশা করি এ ব্যাপারে আপনারা আপনাদের সূচিন্তিত বক্তব্য রাখবেন।' শাহ সউদ চুপ করলেন। নেমে এল নীরবতা।

এবার কথা বললেন আনোয়ার রশিদ। তিনি বললেন, ফিলিস্তিনের মুক্তির জন্য আপনি যে পথ তিনটির কথা উল্লেখ করেছেন, তারই কোন একটি পথ ধরে আমাদের এগুতে হবে। এ পথগুলোর সুবিধা-অসুবিধা সম্পর্কে আমাদের সকলের যে ধারণা, তা একরূপই হবে বলে আমার বিশ্বাস। আমার অনুরোধ, আপনিই এ ব্যাপারে প্রথম বক্তব্য রাখবেন।

প্রেসিডেন্ট আবেদীন, বাদশাহ হাসান শরিফ, প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল প্রমুখ উপস্থিত সকলেই আনোয়ার রশিদের প্রস্তাবকে সহাস্যে সমর্থন জানালেন।

শাহ সউদ ধীরে ধীরে মুখ তুললেন। মনে হলো একটু ভাবলেন তিনি। কাগজপত্র একটু নাড়াচাড়া করলেন। তারপর বলতে শুরু করলেন, আমরা সকলেই জানি সোভিয়েত, বৃটেন ও আমেরিকা ইহুদী শক্তির পিছনে না থাকলে ফিলিস্তিনে ইহুদী আমদানি সম্ভব হতো না, জাতিসংঘে ফিলিস্তিন বিভক্তির প্রস্তাব উঠত না, পাশও হতো না এবং ইসরাইল রাষ্ট্রও জন্মলাভ করত না। বাইরে থেকে আমরা শক্তি প্রয়োগ করে ফিলিস্তিন মুক্ত করতে পারব না। কারণ সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকার সাথে যুদ্ধ করার মত শক্তি আমরা এখনও অর্জন

করতে পারিনি। ইসরাইলের সাথে আমাদের কয়েকটি যুদ্ধ থেকে পরিষ্কার হয়ে গেছে ও পথ আমাদের সাফল্যের পথ নয়। চাপ প্রয়োগের কথা আমরা ভাবতে পারি। তৈল-অস্ত্রের সাহায্যে আমরা সে চাপ দিয়ে আসছি। কিন্তু এ চাপেরও একটা সীমা আছে, সে সীমা আমরা অতিক্রম করতে পারি না। তৈল অস্ত্র প্রয়েগে কিছু ফল আমরা পেয়েছি, আরও কিছু ফল পেতে পারি। কিন্তু ফিলিস্তিনের মুক্তি এর দ্বারা আসতে পারে না। আর একটি পথ বাকি থাকে। সেটা হলো ফিলিস্তিনের অভ্যন্তর থেকে স্বয়ংক্রিয় বিপ্লবের মাধ্যমে ফিলিস্তিনের মুক্তি। আমার মতে ফিলিস্তিনের মুক্তির এই পথই একমাত্র সঠিক পথ। জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের এই পথেই আমাদের এগুতে হবে। আমি আনন্দিত যে, সাইমুম জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সে পথ রচনা করেছে। শাহ্ সউদ চুপ করলেন।

মুহূর্ত কয়েক নীরবতা। তারপর কথা বললেন আলজিরিয়ার প্রেসিডেন্ট। তিনি বললেন, আন্তর্জাতিক দিক থেকে এ পথটি নিরাপদ। কিন্তু বিষয়টি অত্যন্ত জটিল ও সময় সাপেক্ষ।

আনোয়ার রশিদ বললেন, বিষয়টি জটিল ও সময় সাপেক্ষ অবশ্যই, কিন্ত অসম্ভব নয়। সাইমুম যে পথ ধরে এগুচ্ছে, তা একে অনেক সহজ করে দেবে।

বাদশাহ হাসান শরিফ ও প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল নীচু স্বরে কিছূ কথা বললেন। পরে প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল বললেন, আমরা যে পথে এগুতে যাচ্ছি, তার সাফল্যের অধিকাংশ নির্ভর করছে সাইমুমের কর্মতৎপরতার উপর। আমাদের মোহতারাম ভাই আহমদ মুসা উপস্থিত আছেন, তার বক্তব্য আমরা শুনতে পেলে আমাদের আলোচনা সহজ হতো।

শাহ সউদ মাথা নেড়ে বললেন, ঠিক। স্মিত হেসে আহমদ মুসার দিকে চাইলেন।

আহমদ মুসা বললেন, মোহতারাম শাহ্ সাহেব যে মত প্রকাশ করেছেন আমার বক্তব্যও সেটাই। আমি আনন্দিত যে, আমরা সবাই একই লাইনে চিন্তা করছি। আর সাইমুমের গোটা সংগঠন গড়ে উঠেছে এই দর্শনের উপর ভিত্তি করেই। আপনারা যে সর্বাত্মক সাহায্য সহযোগিতা দিয়ে আসছেন, তা অব্যাহত থাকলে আমি নিশ্চয়তা দিতে পারি যে, আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারব।

আপনারা শুনে সুখী হবেন যে, ইসরাইলের ‘দ্রুজি’ সম্প্রদায়ের সাথে আমাদের চুক্তি হয়েছে। ইসরাইলের স্থল, বিমান ও নৌবাহিনীতে ওদের ১৪ হাজারের মত লোক রয়েছে। ওদের সর্বাত্মক সাহায্য আমরা পাব। এতদিন ইসরাইলী আর্মির অভ্যন্তরে প্রবেশ ছিল অসম্ভব। আল্লাহর অনুগ্রহে এখন সে সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ইসরাইলীদের ইহুদীকরণ প্রচেষ্টায় অসন্তুষ্ট ক্ষুব্ধ ‘দ্রুজিরা’ আমাদের সব রকম সাহায্য দেবে। আহমদ মুসা চুপ করল। নেমে এল নীরবতা।

নীরবতা ভাঙ্গলেন শাহ সউদ নিজে। “ফিলিস্তিনে কোন স্বয়ংক্রিয় বিপ্লব বা গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে যদি আমরা ইসরাইল রাষ্ট্রের উৎখাত করতে চাই, তাহলে ফিলিস্তিনী মুসলিম জনসাধারণের প্রতিনিধি ও মুখপাত্র হিসেবে সাইমুমের আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করতে হবে। আর তার আগে আমাদের তরফ থেকে স্বীকৃতি দিতে হবে। আমরা মুসলিম দেশগুলো যদি জাতিসংঘে প্রস্তাব আনি এবং আমাদের প্রভাব কাজে লাগাই, তাহলে সাইমুম জাতিসংঘের স্বীকৃতি লাভ করবে। ভবিষ্যতে এই আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই কাজে আসবে।”

মরক্কোর বাদশা শরিফ বললেন, ‘শাহ সাহেব উপযুক্ত পরামর্শ দিয়েছেন। ফিলিস্তিনে অন্তর্বিপ্লবের পরিকল্পনা যদি আমাদের সফল হয়, তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুবই উপকারে আসবে। অবশ্য সে বিপ্লব যদি নিছক সরকার পরিবর্তন ধরনের হয়, তাহলে ঐ আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি খুব গুরুত্ববহ হবে’।

বাদশাহ আবুল হিশাম বললেন, আমরা কি আজই এ ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিব?

প্রেসিডেন্ট হাফিজ আল-সাল্লাল বললেন, সিদ্ধান্ত আমরা আজই নিচ্ছি। কিন্তু তা আমরা ঘোষণা করব আমাদের আসন্ন রাবাত শীর্ষ সম্মেলনে এবং তারপর থেকেই সাইমুমের জন্য আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায়ের প্রচেষ্টা চালাব।

শাহ সউদ বললেন, হাফিজ সাহেব ঠিক বলেছেন। রাবাত সম্মেলনেই আমরা আমাদের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করব। শাহ সউদ একটু চুপ করলেন। তারপর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বললেন, লক্ষ লক্ষ নিরাশ্রয় ও দুঃখী মানুষের পক্ষ থেকে এ গুরু দায়িত আপনার উপর বর্তেছে। আমরা গর্বিত যে, সাইমুম এ দায়িত্ব

পালনে সমর্থ। আমরা এখন জানতে পারলে উপকৃত হবো যে, অন্তর্বিপ্লবের পরিকল্পনা আপনার কি হবে এবং সে ক্ষেত্রে আমাদের কি করণীয় থাকবে?

আহমদ মুসা একটু নড়ে-চড়ে বসলেন। কপালে তাঁর চিন্তার বলিরেখা স্পষ্ট। মুখটি তাঁর প্রশান্ত। চোখ দু'টি তাঁর ভাবনার কোন অতল গভীরে। ধীরে ধীরে মুখ খুললো আহমদ মুসা। বল সে, আন্তর্বিপ্লবের পথ অত্যন্ত জঠিল ও ঝুঁকিপূর্ণ। আমরা শুধু শক্তি দিয়ে ৩০ লাখ ইহুদীর কাছ থেকে রাষ্ট্রক্ষমতা কেড়ে নিতে পারব না আমাদেরকে কৌশলের পথ ধরতে হবে। ইসরাইলী নেতাদের পারস্পরিক বিরোধের সুযোগ আমাদের নিতে হবে। উচ্চাভিলাষী মোশেহায়ান ক্যাবিনেট থেকে সরে দাঁড়িয়েছে। ইসরাইলী আর্মির সাবেক সর্বাধিনায়াক জেনারেল রবিন রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের চেষ্টা করছেন আমরা জানি। ইসরাইল আর্মির এক বিরাট অংশের উপর এই দুইজনের প্রভাব রয়েছে। ইসরাইলের বন্ধু দেশগুলোও তাদের রাজনৈতিক উচ্চভিলাষ সম্পর্কে জ্ঞাত আছে। আমরা তাদের দু'জনকে কাজে লাগিয়ে ইসরাইলী জনগণ ও সেনাবাহিনী এবং ইসরাইলের বন্ধুরাষ্ট্রদের বিভ্রান্ত করবো। বিভ্রান্তি কাটিয়ে প্রকৃত বিষয় তারা বুঝে ওঠার পূর্বেই আমরা আমাদের প্রতিষ্ঠিত করতে পারব বলে আশা করছি। আহমদ মুসা একটু থামলেন। আবার শুরু করলেন, এর উপর আমরা যদি আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি পাই, তাহলে ভবিষ্যতে তা আমাদের খুব উপকারে আসবে। আমরা আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি লাভের পর ইসরাইল সরকারের সাথে আপোষমূলক মনোভাব আপনাদের দেখাতে হবে। আমি যতদূর জানি, ইসরাইল স্বীকৃতির আশ্বাস পেলে তার অধিকৃত সব এলাকা সে ছেড়ে দিবে। ইসরাইলের সাথে এ ধরনের সমঝোতার পথ আপনাদের করতে হবে। আর এ সমঝোতা চেষ্টা পাবলিসিটি ওর্য়াক বেশী করতে হবে। ইসরাইল আর্মি এবং সেখানকার জনসাধারণের এক বিরাট অংশ এই পরিকল্পনার বিরুদ্ধে। সুতরাং ইসরাইল সরকারের এই আপোষমূলক মনোভাবের বিরুদ্ধে তারা বিক্ষুব্ধ হবে। আর আমরা এরই সুযোগ গ্রহণ করব। সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন ও আমেরিকা আন্তরিকভাবে চায় না যে, ইসরাইল ও আরবরা পূর্ণ সমঝোতায় পৌঁছুক। সুতরাং

আমাদের সাথে আপোষমুখী ইসরাইল সরকারের বিরুদ্ধে কোন আভ্যন্তরীণ অভ্যুত্থনকে তারা কোনরূপ সন্দেহের চোখে দেখবে না। আহমদ মুসা থামলো।

প্রেসিডেন্ট শিবলি সোহায়েল কথা বললেন। তিনি উঠে দাঁড়িয়ে আহমদ মুসার ডান হাতটি হাতে নিয়ে একটি ঝাঁকুনী দিয়ে বললেন, খায়ের! খায়ের!! চমৎকার বুদ্ধি, চমৎকার পরিকল্পনা। মোবারকবাদ আপনাকে।

শাহ সউদের চোখ বুজে গিয়েছিল। ধীরে ধীরে তিনি চোখ খুললেন। হাঁ, পরিকল্পনা ও প্রস্তাবগুলো খুব সমীচীন, সূচিন্তিত। কিন্তু সমস্যা দেখা দেবে বিপ্লবের প্রকৃতি প্রকাশ হয়ে পড়ার পর। আমেরিকা মরিয়া হয়ে কিছু করে না বসে। অবশ্য আফ্রো-এশিয়াসহ চীন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশগুলো যদি আমাদের পাশে দাঁড়ায়, তাহলে আমেরিকা সে সাহস পাবে না। তাছাড়া সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিরপেক্ষ রাখার ব্যবস্থা করতে হবে আমাদের।

আনোয়ার রশিদ ও হাফিজ আল-সাল্লাল প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, আমরা তা পারব। আমরা যদি তাকে তার প্রভাব বলয়ের অক্ষুন্নতার নিশ্চয়তা দান করি, তাহলেই এটা করতে পারব।

বাদশাহ আবুল হিশাম, ফারুক আল-নিমেরী, হাফিজ আল-সাল্লাল, শিবলি সোহায়েল প্রমুখদের মধ্যে টুকিটাকি আলোচনা চলতে লাগল। শাহ সউদ তাঁর টেবিলের সাদা বোতামে মৃদু চাপ দিলেন। তারপর বললেন, আমরা এখন নাস্তা করব। আমাদের এতক্ষণের আলোচনায় যে সিদ্ধান্তে পৌঁছলাম, তা হলোঃ

(১) অন্তর্বিপ্লবের মাধ্যমে ফিলিস্তিন মুক্ত করতে হবে।

(২) সাইমুমকে ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা স্বীকৃতি দেব এবং আন্তর্জাতিক স্বীকৃতি আদায় করবো।

(৩) ইসরাইল সরকারকে আমরা এমন ধরনের মৈত্রীতে আবদ্ধ করতে চেষ্টা করব, যাতে সেখানকার জনগণ ও সেনাবাহিনী বিক্ষুব্ধ হয়।

(৪) অর্থবল, লোকবল, অস্ত্রবল-যে সাহায্যই সাইমুমের প্রয়োজন পড়বে তা আমরা দিব।

শাহ সউদ থামলেন। তিনি চুপ করতেই সাউন্ড প্রুফ ঘরটির দেয়াল ফেটে একটি দরজা বেরুল। দরজা দিয়ে নাস্তার ট্রে ঠেলে প্রবেশ করল শাহ সউদের খাস বেয়ারা শরিফ ইবনে আলী আকরাম।

রাবাতের আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর। কঠোর প্রহরা চারিদিকে। দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও সীমিত সংখ্যক সাংবাদিক ছাড়া বেসামরিক কোন লোকের চিহ্ন কোথাও নেই। আর মিনিট সাতেকের মধ্যেই শাহ সউদের বিশেষ বিমানটি ল্যান্ড করবে। মরক্কোর বাদশা হাসান শরিফ এবং মন্ত্রিসভার সদস্যবৃন্দ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন তাঁর। উর্ধতন সামরিক অফিসার ও বিমান কর্মচারীদের ইতস্তত বিচরণ করতে দেখা যাচ্ছে। 'গার্ড অব অনার' দেয়ার জন্য সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট প্রস্তুত রয়েছে। সালাম গ্রহণ মঞ্চের পাশেই দাঁড়িয়ে আছে বুলেট-প্রুফ সুদৃশ্য গাড়ী, ওদেরই একটি বহন করবে শাহ সউদ ও বাদশাহ হাসান শরিফকে।

আহমদ মুসা ভি, আই, পি, রুম থেকে বেরিয়ে বিমান চত্বরে একটি চক্কর দিয়ে টয়লেটের দিকে চললো। সাধারণ আরবী পোশাক তাঁর দেহে। টয়লেটে ঢুকতে গিয়ে একটি মুখের দিকে নজর পড়তেই তার চিন্তা যেন হোঁচট খেল। কাঁধে ক্যামেরা ঝোলানো একজন লোক বেরিয়ে আসছিল টয়লেট থেকে। সোডিয়াম লাইটের ধবধবে আলো লোকটির মুখের প্রতিটি রেখা যেন আহমদ মুসার কাছে স্পষ্ট করে তুলল। জোড়া ভ্রু, নাকের ডানপাশে কাটা দাগ, ঝুলে পড়া ঠোঁট, কোথায় যেন এ মুখ তিনি দেখেছেন। লোকটির পিছনে আর একজন লোক বেরিয়ে এল। এই লোকটিকে আহমদ মুসা চেনে-বাদশা শরিফের খাস ড্রাইভারদের প্রধান।

আহমদ মুসা টয়লেটে ঢুকলো। কিন্তু উড়োজাহাজের প্রফেলারের মত চিন্তা তার মাথায় ঘুরপাক খাচ্ছিল-'তাস'-এর এ সাংবাদিক ভদ্রলোকটি কে?

হঠাৎ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠল ডসিয়ার এলবামের একটি মুখ, সেই জোড়া ভ্রু, নাকের ডানপাশে কাটা দাগ, ঝুলে পড়া ঠোঁট। নাম ইসাক এলিস। ইরগুণ জাই লিউমির দুর্ধর্ষ ইহুদী স্পাই। কথাটা মনে হওয়ার সাথে সাথে গোটা শরীর রোমাঞ্চ দিয়ে উঠল আহমদ মুসার। 'ইরগুণ জাই লিউমি'র অপারেশন স্কোয়ার্ডের মধ্যমণি ইসাক এলিস এখানে? 'তাস' করেসপন্ডেন্ট সে কবে থেকে? বিজলির চমকের মত আর একটি প্রশ্ন ছুটে এল তাঁর মনে-খাস ড্রাইভার প্রধান শরীফ আলম ইসাক এলিসের পিছনে বেরিয়ে গেল কেন? শাহ ফয়সালের শাহাদতের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটতে যাচ্ছে না তো? কেঁপে উঠল মুসার লৌহ হৃদয়ও। আকাশে জেট ইঞ্জিনের শব্দ শোনা যাচ্ছে, ল্যান্ড করছে শাহ সউদের বিমান। টয়লেট থেকে ছুটে বেরিয়ে গেলো আহমদ মুসা। ঐ তো রানওয়ে দিয়ে ছুটে আসছে শাহ সউদের বিশেষ বিমানটি। বাদশাহ হাসান শরিফ ও উর্ধতন নেতৃবৃন্দ বিমান চত্বরে এসে দাঁড়িয়েছেন মহান অতিথিকে সম্বর্ধনার জন্য। দ্রুত কাজ করছিল আহমদ মুসার মন। বিন্দু বিন্দু ঘাম তাঁর কপালে। চোখে তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্তের ছাপ।

টয়লেট থেকে বেরিয়ে সে সোজা গেলো সালাম গ্রহণ মঞ্চের পিছনে দাঁড়ানো আবুল আসের কাছে। আবুল আস সাইমুমের রাবাত ইউনিটের প্রধান। খুব নীচু গলায় আহমদ মুসা বলেলো, 'তাস' করেসপন্ডেন্টের দিকে নজর রেখো, ওকে আমাদের চাই-ই। ড্রাইভার শরিফ আলমকেও সন্দেহ করছি। বলেই আহমদ মুসা দ্রুত ফিরে এলো বিমানের দিকে। বিমানের খোলা দরজায় সিঁড়ি লাগানো হয়ে গেছে। পরক্ষণেই দেখা গেল, শাহ সউদ নেমে আসছেন সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির গোড়ায় দাঁড়িয়ে বাদশাহ হাসান শরিফ। আহমদ মুসা গিয়ে দাঁড়ালেন বাদশাহর পাশে। মন তাঁর ছটফট করছিল। অবিলম্বে কয়েকটি কথা বলা দরকার বাদশাহকে। কিন্তু ফুরসৎ কই? এখান থেকে সোজা ওঁরা যাবেন সালাম গ্রহণ মঞ্চে, তারপর সেখান থেকে গাড়ীতে। কিন্তু বলতেই হবে তাঁকে কথা।

সুযোগ জুটে গেল। বিমান চত্বর থেকে ফেরার পথে শাহ্ সাহেব ও প্রধানমন্ত্রী হাস্যালাপ করছিলেন। সেই সুযোগে আহমদ মুসা বাদশাহকে বলল, এই মুহূর্তেই আপনাকে দু'টি আদেশ দিতে হবে, অত্যন্ত জরুরী।

বাদশাহ কিছুটা উদ্বেগ নিয়ে বললেন, বলুন।

পূর্ব নির্দিষ্ট গাড়ী বাদ দিয়ে সেনাবাহিনীর গাড়ী কিংবা অন্য কোন গাড়ীতে আপনাদের যাবার ব্যবস্থা করতে বলুন, ড্রাইভার শরিফ আলমকে অবিলম্বে গ্রেপ্তার করতে বলুন, আর 'তাস' করেসপন্ডেন্টকে আমরা গ্রেপ্তার করতে চাই।

-কিছু হয়েছে, কিছু ঘটেছে? এবার স্পষ্ট উদ্বেগ ঝরে পড়ল বাদশাহর কন্ঠে। তিনি প্রায় দাঁড়িয়ে পড়লেন।

-পরে সব জানতে পারবেন, আপনার রায় বলুন।

-আমি আবু আমরকে এখনই নির্দেশ দিচ্ছি। আবু আমর মরক্কোর সিকিউরিটি প্রধান।

গার্ড অব অনার শেষে সাংবাদিকদের সাথে সংক্ষিপ্ত দু'চারটি কথা বলার পর বাদশাহ হাসান শরিফ ও শাহ সউদ যখন সেনাবাহিনীর একটি গাড়ীর দিকে এগুচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় পূর্ব নির্দিষ্ট গাড়ীর পাশে এ্যাটেনশনভাবে দাঁড়ানো ড্রাইভার শরিফ আলমকে দু'জন নিরাপত্তা পুলিশ ধরে নিয়ে গেল।

বাদশাহর গাড়ী চলে যাবার পর বিমান বন্দরের বহিরাঙ্গন থেকে সাংবাদিকদের জন্য নির্দিষ্ট খোলা জিপটিও যাত্রা করল। দেখা গেল 'তাস' করেসপন্ডেন্ট আঁদ্রে শুখানভ ওরফে ইসাক এলিসও উঠে বসলেন ড্রাইভারের পাশের সিটে। সাংবাদিকদের জীপের পিছনে আর একটি ল্যান্ড রোভার ষ্টার্ট নিল। গাড়ীর পিছনের সিটে দু'জন মুকোশধারী, ড্রাইভিং সিটে আবুল আস নিজে। তাঁদের গাড়ী যখন বিমান বন্দরের গেট পার হলো, সেই সময় পিছন থেকে প্রচন্ড বিষ্ফোরণের শব্দ শোনা গেল। সালাম গ্রহণ মঞ্চের পার্শ্বে দাঁড়ানো ড্রাইভার শরীফ আলমের গাড়ীর ছাদ প্রচন্ড বিষ্ফোরণে উড়ে গেছে-জ্বলছে লিমোজিনটি। আবুল আস দেখতে পেল-সামনের সাংবাদিক জিপটি থেমে গেছে। জীপ থেকে লাফিয়ে পড়লেন রয়টার এবং এ, এফ, পি'র করেসপন্ডেন্ট। ছুটছেন তাঁরা বিমান বন্দরের

দিকে দুর্ঘটনা দেখার জন্য। একটু পরে আঁদ্রে শুখানভ ওরফে ইসাক এলিসও নামলেন। আবুল আসের গাড়ীটিও সাংবাদিক জীপের পিছনে এসে থেমে গিয়েছিল। আর একটি নীল রংয়ের ভক্সওয়াগন এসে আবুল আসের গাড়ীর পিছনে থেমে গেল। আবুল আস মুখোশধারীদের একজনকে বললো, 'তুমি আমার সাথে এসো।' বলে আবুল আস গাড়ী থেকে নেমেই দেখলো, এলিস পিছনের গাড়ীটার পাশে প্রায় পৌঁছতেই দরজাটি হঠাৎ খুলে গেল, আর ঝুপ করে সে ঢুকে গেল গাড়ীর ভিতরে। সঙ্গে সঙ্গে নড়ে উঠলো গাড়ী। ব্যাপারটি বুঝে ফেলল আবুল আস। গুলী করল সে গাড়ীর টায়ার লক্ষ্য করে। কিন্তু লক্ষ্যভ্রষ্ট হলো সে গুলী। গাড়ীটির জানালা দিয়ে ডিম্বাকৃতি একটি বস্তু ছুটে এসে সশব্দে ফেটে গেল। মুহূর্তের মধ্যে গাঢ় কাল ধোয়ায় ছেয়ে গেল স্থানটি। আবুল আস তার নিজের গাড়ীও ঠাহর করতে পারলো না ধোঁয়ার সেই গাঢ় আবরণে। মুহূর্তকয় পর ধোঁয়া যখন সরে গেল, তখন পিছনের গাড়ীটির কোন অস্তিত্ব কোথাও নেই।

ইসাক এলিসকে নিয়ে এয়ারপোর্ট রোড ধরে তীব্র বেগে ছুটে চলছিল সেই নীল রংয়ের ভক্সওয়াগন। এলিসসহ মোট তিনজন আরোহী। এলিস পিছনের অন্ধকার ঢাকা পথের দিকে চেয়ে আশ্বস্ত হলো -না কেউপিছু নেয়নি। পরে পাশের লোকটির দিকে চেয়ে বলল, 'শরিফ ধরা পড়েছে রবিন।' রবিন নামক লোকটি বলল, শাহ ও বাদশাহকে অন্য গাড়ীতে দেখেই আমি তা বুঝতে পেরেছিলাম।

টাইম বোম্ব সে যথাসময়েই গাড়ীতে সেট করতে পেরেছিল, কিন্তু শেষ মুহূর্তে সব পন্ড হলো কি করে আমি তাই ভাবছি। বলল এলিস।

-আপনার পিছু নিয়েছিল ওরা কারা?

-যারাই হোক, সরকারের লোক নয়, এরাই ধরিয়ে দিয়েছে শরিফ আলমকে।

-আমার ধারণা, ওরা সাইমুমের লোক। আপনার পরিচয় শুধু ওদের পক্ষেই জানা সম্ভব।

এলিসের গাড়ীর পিছনে নিঃশব্দে ঝড়ের গতিতে ছুটে আসছিল আর একটি গাড়ী। কালো রং-এর ল্যান্ড রোভার। হেড লাইট নিভানো, তাই আগের গাড়ীর আরোহীদের কাছে গাড়ীটি অজ্ঞাতই রয়ে গেছে। গাড়ীতে একজন মাত্র

আরোহী। আরবীয় পোশাক পরিধানে। কানের পাশ দিয়ে নেমে আসা রুমাল মুখের অধিকাংশ ঢেকে রেখেছে। তার পাশে পড়ে রয়েছে একটি সাব-মেশিনগান।

এলিসের গাড়ী এয়ারপোর্ট রোড ছেড়ে জনবিরল এরাবিয়ান হাইওয়েতে গিয়ে পড়ল। এই সময় সামনে থেকে আর একটি গাড়ী এসে পড়ল। তার হেড লাইটের আলোতে এলিসদের গাড়ীসহ পিছনের গাড়ীটি আলোকিত হয়ে উঠল। দূর্ভাগ্যই বলতে হবে পিছনের গাড়ীর আরোহীর। তার অস্তিত্ব সামনের গাড়ীর আরোহীর কাছে পরিস্কার হয়ে গেল। প্রমাদ গুণল পিছনের গাড়ীর আরোহী।

এলিসদের গাড়ীর গতিবেগ বেড়ে গেল। গতিবেগ বাড়ালো পিছনের গাড়ীটিও। পিছনের গাড়ীর আরোহীর চোখ দু'টি সামনের গাড়ীর প্রতি স্থিরভাবে নিবদ্ধ। মুখে তার দৃঢ় সংকল্পের ছাপ। স্পিডোমিটারের কাঁটা কাঁপছে। ৮০ পেরিয়ে কাঁটা ৯০ ছুঁই ছুঁই করছে। সামনের গাড়ীর স্পিডোমিটারের কাঁটা তখন ৮০'তে, পারছে না প্রতিযোগিতায়। পিছনের গাড়ীটি মিনিট দেড়েকের মধ্যেই ধরে ফেলল সামনের গাড়ীটিকে। আগের গাড়ীর নিকটে আসতেই এক ঝাঁক গুলী এসে পিছনের গাড়ীর গায়ে লাগল। তবু বেপরোয়া আরোহীটি তার গাড়ী এনে সামনের গাড়ীর পথ রোধ করে দাঁড়াল। থেমে গেছে এলিসদের গাড়ীও, আলো নিভে গেছে তার। গাড়ীটি থামিয়েই আরবী পোশাকের আরোহীটি সাবমেশিনগানটি নিয়ে গড়িয়ে নেমে পড়েছে নীচে। চোখ তার ইনফ্রারেড গগলস। অন্ধকার স্বচ্ছ হয়ে উঠেছে তার চোখে। ঐ গাড়ী থেকে গুলীবৃষ্টি হচ্ছে। পিছনের গাড়ীর আরবীয় পোশাকের আরোহিটি কোন প্রত্যুত্তর না দিয়ে সাপের মত এগিয়ে চলেছে এলিসদের গাড়ীর দিকে। রাস্তার উত্তর পাশের ঢাল বেয়ে নিঃশব্দে এগুচ্ছিল সে। কোন প্রত্যুত্তর না পেয়ে ওপারের গুলীও বন্ধ হয়ে গেল। আরবীয় পোশাকের আরোহী দেখতে পেল, এলিসের গাড়ীর এপাশে লম্বালম্বি শুয়ে আছে একজন, হাতে তার উদ্যত স্টেনগান। মাথা ঈষৎ উঁচু করে সে চারিদিকটা একবার ভাল করে দেখার চেষ্টা করছে। পিছনের আরবী আরোহীটি গুলী করার লোভ সম্বরণ করল। বোঝা গেল গাড়ীর তিনজন আরোহীর কে কোথায়, তা সে প্রথমে জানতে চায়। গাড়ীর পিছন বরাবর গিয়ে সে থামল। অপর

দু'জনকে সে গাড়ীর পিছনে দেখতে পেল। তাদের একজন শুয়ে, হাতে তার স্টেনগান, অপরজন হাঁটু গেড়ে বসে, হাতে তার রিভলভার। হাঁটু গেড়ে বসা লোকটিই ইসাক এলিস, তা বুঝতে পারল আরবী পোশাকের আরোহী। এলিসদের সকলের দৃষ্টি সামনের আড়াআড়ি করে রাখা আরবী লোকটির ঐ গাড়ীর দিকে। গাড়ীর উত্তর পার্শ্বে গাড়ীর লম্বালম্বি শুয়ে থাকা লোকটিকে এই সময়ে গুটি গুটি গাড়ীর পিছন দিকে আসতে দেখা গেল। আরবীয় পোশাকের আরোহীটি বোধ হয় এভাবে তিনজনকে এক সঙ্গেই চাচ্ছিল। প্রশস্ত মাইল পোস্টের আড়ালে শুয়ে স্টেনগানটি বাঁ হাতে ধরে ডান হাতে রিভলভার থেকে ধীরে সুস্থে প্রথম গুলীটি ছুঁড়ল সে। আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়ল গুটি গুটি করে আসা লোকটি। বিদ্যুৎ গতিতে ফিরে দাঁড়িয়েছিল এলিস। একটু মাথা তুলে ফিরবার চেষ্টা করেছিল গাড়ীর পিছনে শুয়ে থাকা লোকটিও। কিন্তু আরবীয় পোশাকের আরোহীটির দ্বিতীয় গুলী তার কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল একদম মাথার ভিতরে, এলিয়ে পড়ল তার মাথা আবার মাটিতে। এলিসও গুলী ছুঁড়েছিল, কিন্তু লক্ষ্যহীন সে সব। এলিস এবার সঙ্গীর স্টেনগানটি তুলে নিয়ে দৌড়ে দক্ষিণ পার্শ্বে চলে গেল। বোঝা গেল, আরবীয় পোশাকের আরোহীটি ইচ্ছা করেই তৃতীয় গুলীটি ছুঁড়ল না। বরং সে দ্রুত স্থান ত্যাগ করে ঢাল বেয়ে দৌড়ে এলিসের গাড়ীটির ওপাশে গিয়ে উঠল। দেখতে পেল সে, এলিস রাস্তার ওপাশের ঢালে নেমে যাচ্ছে। কয়েক পা সামনে গিয়ে চিৎকার করে উঠল আরবীয় পোশাকের আরোহী স্টেনগান ফেলে দাও এলি কথা শেষ হলো না তার। ঝট করে এলিস পিছনে ফিরে দাঁড়াল, কিন্তু বেপরোয়া এলিসের স্টেনগান থেকে গুলী বেরুবার আগেই আরবীয় পোশাকের আরোহীর তৃতীয় বুলেটটি এলিসের বাম কাঁধে ঢুকে গেল। স্টেনগান পড়ে গেল হাত থেকে, বসে পড়ল সে।

এলিস, এলিসের দুই সহকর্মী ও এলিসের গাড়ীটি সার্চ করে এলিসকে বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে গাড়ী ছেড়ে দিল এবার আরোহীটি। শহরের অকট্রয় পোস্টে আসতেই গাড়ীটি আটকে দিল সেনাবাহিনীর একটি ইউনিট। বুলেটের ঝাকে ঝাঁঝরা হয়ে যাওয়া গাড়ীটি তারা ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু তাদের অফিসার গাড়ীর সমনে এসে আরোহীকে দেখেই চমকে উঠে স্যালুট করে সরে দাঁড়াল।

ঘিরে দাঁড়ানো সৈনিকরাও সরে দাঁড়াল সঙ্গে সঙ্গে। গাড়ীটি চলে যাওয়ার পর অফিসারটি উৎসুক সৈনিকদের জানাল, আহমদ মুসা।

নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে সৈনিকদের বিস্ময়াবিষ্ট চোখ অপসৃয়মান গাড়ীটির দিকে ছুটে গেল আর একবার।

আরবীয় পোশাকের আরোহীটি আহমদ মুসা। এলিসের প্রতি দৃষ্টি রাখবার নির্দেশ আবুল আসকে দিয়েও নিশ্চিন্ত হতে পারেনি। তাই নিজেও পিছু নিয়েছিল তার।

এলিসকে নিয়ে আহমদ মুসা সোজা সাইমুমের রাবাত ঘাঁটিতে এসে হাযির হলো। আহমদ মুসাকে গাড়ী থেকে নামতে দেখে উদ্বেগাকুল আবুল আস ছুটে এল। কিছু বলতে যাচ্ছিল আবুল আস, কিন্তু গাড়ীর ভিতর থেকে হাত-পা বাঁধা এলিসকে পিট পিট করে চাইতে দেখে চমকে উঠে থেমে গেল সে। পরে আহমদ মুসাকে এক পাশে ডেকে বলল, শাহ এবং বাদশাহ দু'বার খোঁজ করেছেন আপনাকে। উদ্বিগ্ন তাঁরা। স্টেট গেস্ট হাউসে তাঁরা অপেক্ষা করছেন।

এলিসকে আবুল আসের হাতে সোপর্দ করে আহমদ মুসা তখনই চলল স্টেট গেস্ট হাউসের উদ্দেশ্যে।

গেস্ট হাউসের গেটে আহমদ মুসার গাড়ী পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে দায়িত্ব পালনরত অফিসার টেলিফোনে খবরটি ভিতরে পৌঁছিয়ে বাইরে এসে আহমদ মুসাকে স্যালুট করে দাঁড়াল। মুহূর্তে খুলে গেল গেট। ভিতরে প্রবেশ করল আহমদ মুসার গাড়ী। শাহ সউদ এবং বাদশাহ হাসান শরিফ দু'জনেই গাড়ী বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছেন। আহমদ মুসা গাড়ী থেকে নামতেই জড়িয়ে ধরলেন প্রথমে বাদশাহ এবং পরে শাহ সউদ।

বাদশাহ বললেন, আল্লাহ এক ভয়ানক দুর্ঘটনা থেকে আমাদের বাঁচিয়েছেন আপনার সাহায্যে।

শাহ বললেন, শুধু আমরা নই, শীর্ষ সম্মেলনটিও রক্ষা পেয়েছে।

-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর। স্মিত হেসে জবাব দিল আহমদ মুসা।

গাড়ীর দিকে চেয়ে ভ্রুকুঁচকে শাহ সউদ বললেন, মনে হচ্ছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে ফিরলেন।

বাদশাহও গাড়ীর দিকে চেয়ে বললেন, "তাই তো!" তারপর তিনি বললেন "চলুন ভিতরে গিয়ে শোনা যাবে সব।"

স্টেট গেস্ট হাউসের সুদৃশ্য ড্রইং রুমে এসে বসলেন তাঁরা।

বাদশাহ প্রথম কথা বললেন, প্রথম চোটেই ড্রাইভার শরিফ আলম সব স্বীকার করেছে। অত্যাধুনিক টাইম বোম্বটি সাপ্লাই দিয়েছে আঁদ্রে শুখানভ।"

-আঁদ্রে শুখানভ নয়, ওর আসল নাম 'ইসাক এলিস' ইরগুণ জাই লিউমির দুর্ধর্ষ স্পাই।

-ইসাক এলিস! চমকে উঠলেন যেন শাহ ও বাদশাহ দু'জনেই। কিছুক্ষণ নির্বাক সকলেই।

প্রথম মুখ খুললেন বাদশাহ। বললেন, দুঃখ হচ্ছে, হাতের মুঠোয় পেয়েও আমরা তাকে ধরতে পারলাম না, আবুল আস কিন্তু চেষ্টার কোন ত্রুটি করেনি।

-আপনি খুশী হবেন, এলিস ধরা পড়েছে। তার দু'জন সাথী নিহত, সেও আহত। এইমাত্র তাকে আমি আবুল আসের হাতে তুলে দিয়ে এলাম।

-আলহামদুলিল্লাহ! ধরা পড়েছে এলিস! সপ্রশংস দৃষ্টিতে তাকালেন বাদশাহ আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা পূর্বাপর সব ঘটনা তাদের জানালেন। সব শুনে বাদশাহ যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন। শাহ সউদ বললেন, আল্লাহ আপনাকে দীর্ঘজীবি করুন। মজলুম মানবতার খেদমতের জন্য আল্লাহ আপনাকে বাঁচিয়ে রাখুন।

আহমদ মুসা বললেন, ইসাক এলিসের গ্রেপ্তারের খবর গোপন রাখতে হবে। আগামীকাল শুধু এইটুকু খবর থাকবে কাগজে, 'বিস্ফোরণের পর থেকে আঁদ্রে শুখানভের অন্তর্ধান ঘটেছে। অবশ্য কোন সাংবাদিকই এর বেশী কিছু বলতে পারবে না।

শরবত এল এ সময়। শরবত পান করার পর প্রসঙ্গান্তর ঘটল।

শাহ সউদ বললেন, এখন থেকে পনর মিনিটের মধ্যে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এখানে আসছেন।

-হঠাৎ তাঁর এ আগমন। বিস্ময় প্রকাশ করল আহমদ মুসা।

-আমার ধারণা, অনুরোধ ও হুমকি দুই-ই নিয়ে আসছেন তিনি।

-কি রকম? পূর্ণ দৃষ্টিতে চাইল আহমদ মুসা শাহ-এর দিকে।

-ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে আমরা যেন আগামীকালের শীর্ষসম্মেলনে সাইমুমকে স্বীকৃতি না দেই, এ অনুরোধ তিনি জানাবেন। আর ইউরোপ ও আমেরিকার প্রাণস্বরূপ তেল নিয়ে অধিক বাড়াবাড়ি করলে আরবদেরকে প্রলয়ংকারী এক যুদ্ধের ঝুঁকি নিতে হবে, এ হুমকি তিনি দেবেন। থামলেন শাহ সউদ।

-'আর এ হুমকি ও অনুরোধের মূল লক্ষ্য হলো ইসরাইল রাষ্ট্রের স্থায়িত্ব নিশ্চিত করা।' শাহ সউদের কথার সঙ্গে যোগ করল আহমদ মুসা।

-ঠিক বলেছেন আপনি। বললেন বাদশাহ।

-জবাব তো নিশ্চয় আপনারা ঠিক করে ফেলেছেন? বলল আহমদ মুসা।

-কেন, আল-আসির বৈঠকে জবাবতো আমাদের তৈরী হয়েই আছে। বললেন শাহ সউদ।

একটু থেমে শাহ সউদ আবার বললেন, তবে উপস্থাপনাটা হবে একটু আলাদা ধরনের।

-যেমন? শাহ সউদের দিকে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চাইল আহমদ মুসা।

-আমরা পরিষ্কার বলে দেব, ফিলিস্তিন নিয়ে আরবরা তিনবার যুদ্ধে নেমেছে, চতুর্থ যুদ্ধে তারা আর নামতে চায় না। এজন্য ফিলিস্তিনের প্রতিনিধি হিসেবে সাইমুমকে স্বীকার করে নিয়ে ফিলিস্তিন সম্পর্কিত সমস্ত দায়-দায়িত্ব তার কাঁধে ছেড়ে দিয়ে আরব রাষ্ট্রগুলো ফিলিস্তিনের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়া থেকে অব্যাহতি পেতে চায়। আর তেল অবরোধের সাথে ফিলিস্তিন সমস্যা ও অধিকতর আরব এলাকা প্রত্যার্পণের প্রশ্ন জড়িয়ে আছে। সাইমুমকে স্বীকৃতি দেয়ার পর এবং ইসরাইলের নিকট থেকে অধিকৃত সব এলাকা ফিরিয়ে পাওয়ার পর ফিলিস্তিন প্রশ্ন আরবদের কাছে গৌণ হয়ে পড়বে, তৈল অবরোধের কোন প্রশ্নও তখন আর উঠবে না। আর এ কথাও আমরা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দেব, ইসরাইল অধিকৃত এলাকা ফিরিয়ে দিলে ইসরাইলের সঙ্গে তাদের শান্তিচুক্তিও হতে পারে। থামলেন শাহ সউদ।

হাসি খেলে গেল আহমদ মুসার মুখে। বলল সে, আমি আশা করছি মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মহোদয় খুশীই হবেন।

-আবার একে new startegy মনে করতে পারেন তিনি। শাহ সউদ হেসে বললেন।

-তা অবশ্য পারেন। করবেনও হয়ত তিনি। কিন্তু আরব রাষ্ট্রগুলো যে ইসরাইলের ব্যাপারে কিছুটা soft লাইন নিয়েছে, এই বোধ তাকে আশ্বস্ত করবে। এর ফলে তারা পারস্পরিক আলোচনার সুফল সম্পর্কে আশাবাদী হবে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই বাদশাহ হাসান শরিফের লাল টেলিফোনটি বেজে উঠল। এয়ারপোর্ট থেকে টেলিফোন। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী মিঃ হেনরী স্ট্রাফোর্ডকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইসমাইল আবু বকর বিমান বন্দরে স্বাগত জানিয়েছেন। তাঁরা আসছেন।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আমাকে এবার যেতে হয়। ওদিকে কিছু কাজও পড়ে আছে। এযাযত দিন।

-কাজ থাকবেই, কিন্তু এই মুহূর্তে বিশ্রাম আপনার খুব প্রয়োজন।

শাহ এবং বাদশাহ আহমদ মুসাকে গাড়ী বারান্দা পর্যন্ত এগিয়ে দিলেন। তাঁদের সালাম দিয়ে গাড়ীতে বসল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার গাড়ী যখন পার্ক এভিনিউ অতিক্রম করছিল, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে নিয়ে একটি গাড়ীর মিছিল তখন স্টেট গেস্ট হাউসের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল।

৪

কোড ডিসাইফার খুলে ভ্রু কুচকে উঠল সিনবেথ প্রধান ডেভিড ডোবিনের। কোড বুকটা ভালো করে নেড়ে চেড়ে দেখল পাতাগুলো কেমন আলগা আলগা। প্রতিটি পাতায় চাপ দিয়ে ফ্ল্যাট করার লক্ষণ স্পষ্ট। ডোবিন বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করল, চাপের ফলে মাঝখানের কয়েকটা পাতার পেস্টিং আঠা পর্যন্ত আলগা হয়ে গেছে। স্পষ্টই বুঝা যায়, বইটি জোর করে মেলে রাখতে গিয়েই এমনটা ঘটেছে।

কপালটাও কুঞ্চিত হলো ডোবিনের।

পাশ থেকে আরও একটি বই টেনে নিল ডোবিন। বহুল পঠিত বই। কিন্তু পাতাগুলো অসম হয়নি। বিস্ময়টা ধীরে ধীরে সন্দেহের এক কুয়াশায় রূপ নিল।

ডোবিন ভূ-গর্ভস্থ সিকুরিটি রুম থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে নিজের কক্ষে চলে এল। বিশাল টেবিলের পাশে বিশাল চেয়ারটায় বসে ডোবিন ইন্টারকমে সহকারী আইজাককে বলল, তুমি একটু এস এখানে। এক মিনিটের মধ্যেই আইজাক এসে প্রবেশ করল ডোবিনের রুমে।

আইজাককে বসার জন্যে ইঙ্গিত করে ডোবিন বলল, এ কোড ডিসাইফারটা কে নিয়েছিল?

-স্মার্থা, দেশরক্ষা সচিব এরহান শালর্টকের মেয়ে।

-ও মনে পড়েছে। কয়দিন রেখেছিল বইটা?

-৭ দিন।

-স্মার্থা মেয়েটাতো ভালো।

বলে চোখ বুজল ডোবিন। মুহূর্তকয় পরে চোখ খুলল। ডিসাইফার আইজাকের হাতে দিয়ে বলল, ডিসাইফারের পাতায় যে ফিংগার প্রিন্টগুলো আছে তা নিয়ে আস এখুনি।

বইটি নিয়ে আচ্ছা বলে আইজাক বেরিয়ে গেল।

মিনিট পনর পরে আইজাক ডোবিনের ঘরে ফিরে এল ফিংগার প্রিন্ট নিয়ে।

ঘরে প্রবেশ করতেই ডোবিন বলল, কি পেলে আইজাক?

-স্যার ডসিয়ারের সবগুলো ফিংগার প্রিন্ট পরিচিত শুধু একটি ছাড়া।

-অপরিচিত ফিংগার প্রিন্ট কত জায়গায় পেয়েছ?

-যতগুলো পাতা দেখেছি, সবগুলোতেই আছে। আর.......

-আর কি?

ডোবিনের চোখে নতুন কৌতুহল।

-কয়েকটা পাতার আমি Ray একজমিনও করেছি।

-করেছ, কি পেয়েছ তাতে?

চেয়ারে সোজা হয়ে বসল ডোবিন। তার ধারাল চোখ আইজাকের চোখে।

-সাধারণ আলো থেকে একশ গুণ বেশী শক্তিশালী এক ধরনের Ray প্রতিফলন চিহ্ন পাওয়া গেছে ডসিয়ারের পাতায়।

একপোচ কালি যেন ছড়িয়ে পড়ল ডোবিনের গোটা মুখে। এক লহমায় তার বয়সটা ১০ বছর বেড়ে গেল। চোখের ধারাল দৃষ্টি যেন নিস্তেজ হয়ে গেল। কপালের ভাজগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠল।

সে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগল। পায়চারি করতে করতে আইজাকের কাছে এসে অপরিচিত সেই ফিংগার প্রিন্টটি তার কাছ থেকে নিয়ে চোখের সামনে ধরল। দেখে স্বগতঃই উচ্চারণ করল, মহিলার ফিংগার প্রিন্ট। আইজাকের হাতে ফেরত দিয়ে ডোবিন বলল, স্মার্থা ছাড়া আর কারো হাতে গেছে এই ডসিয়ার?

'না' সূচক মাথা নাড়াল আইজাক।

-তাহলে অন্য কিছু চিন্তা করার আগে স্মার্থাকেই একবার জিজ্ঞেস করতে হয় আর কারো হাতে এই ডসিয়ার পড়েছিল কি না?

একটু থামল ডোবিন। তারপর বলল, আইজাক, যাও, ড্রাইভারকে গাড়ীতে উঠতে বল। আমি দেশরক্ষা সচিবের বাসায় যাব। টেলিফোনে ওর কাছ থেকে অনুমতি নিচ্ছি।

আইজাক বেরিয়ে গেল।

ডোবিন লাল টেলিফোনের রিসিভারটা তুলে নিল হাতে।

কোড ডিসাইফারটা এমিলিয়ার হাতেও গেছে এ কথা জেনে নিয়ে ডোবিন ছুটল এমিলিয়ার বাড়ীতে।

ডেভিড বেনগুরিয়ানের ছেলে ডেভিড সালেম সলোমন যুদ্ধে একটা পা ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় সেনাবাহিনী থেকে রিটায়ার করেছেন অনেক আগে। ডাকসাইটে একজন অফিসার ছিলেন তিনি সেনাবাহিনীর। এখন একজন শিল্পিপতি ব্যবসায়ী হিসেবে সকলের সম্মানের পাত্র তিনি। তাছাড়া ডেভিড বেনগুরিয়ানের ছেলে হিসেবেও তার একটা বিশেষ মর্যাদা আছে সবার কাছে।

ডোবিন সেনাবাহিনীতে ডেভিড সালেমের অনেক জুনিয়র ছিল। সালেমের ড্রয়িং রুমে বসে তার অপেক্ষা করছিল ডোবিন।

ডেভিড সালেম এসে ড্রয়িং রুমে প্রবেশ করতেই উঠে দাঁড়িয়ে স্যালুট দিল ডোবিন। বলল, স্যার অসময়ে এসেছি, এমিলিয়ার সাথে একটু কথা বলতে চাই।

ডোবিনের মুখের দিকে তাকিয়ে সালেম বলল, বস ডোবিন। তোমাকে খুব উদ্বিগ্ন মনে হচ্ছে।

-জি স্যার।

-ব্যাপার কি, কিছু ঘটেছে?

-আমাদের নতুন কোড ডিসাইফারটাও আমাদের হাতের বাইরে চলে গেছে বলে মনে হচ্ছে।

-হাতের বাইরে মানে শত্রুর হাতে? কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল। ডেভিড সালেমের।

-শত্রুর হাতে গেছে কি না এটা এখনও স্পষ্ট নয়। এজন্যেই এমিলিয়ার সাথে এ ব্যাপারে কয়টা কথা বলতে চাই।

-এমিলিয়ার সাথে, এ ব্যাপারে?

বিস্ময় ঝরে পড়ল ডেভিড সালেমের কণ্ঠ থেকে।

-জি স্যার, কোড ডিসাইফারটা এমিলিয়ার হাতেও গিয়েছিল।

-ব্যাপারটা খুলে বলতো ডোবিন।

এবার কিছুটা উদ্বেগ ডেভিড সালেমের কন্ঠে।

সোফায় একটু নড়ে চড়ে বসে ডোবিন বলল, দেশরক্ষা সচিব এরহান শার্লটকের মেয়ে স্মার্থা মোসাদে ট্রেনিং নিচ্ছে। দেশরক্ষা সচিবের কথায় তাকে ৭ দিনের জন্যে কোড ডিসাইফারটা দিয়েছিলাম। ডিসাইফারটা ফেরত পাওয়ার পর আমরা চেক করতে গিয়ে দেখেছি, ডিসাইফারটার ফটো কপি করা হয়েছে। কার দ্বারা হয়েছে আমরা জানি না। যেহেতু কোড বইটা স্মার্থার কাছ থেকে এমিলিয়াও নিয়েছিল, তাই আমরা তাকেও কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করতে চাই।

উদ্বেগ ফুটে উঠল ডেভিড সালেমের চোখেও। তিনি সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা ইউনিটেও দীর্ঘদিন কাজ করেছেন। তিনি জানেন, ছোট্ট ঐ কোড বইটার কত মূল্য। জাতীয় নিরাপত্তার প্রশ্নই শুধু নয়, জাতির গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের জীবন ঐ কোড বইটা। ডেভিট সালেম বলল, তুমি সাংঘাতিক খবর শোনালে ডোবিন, শত্রুরা আমাদের কোডের কপি পেয়ে গেলে সর্বনাশ। এমিলিয়াকে আমি ডেকে দিচ্ছি।

বলে ডেভিড সালেম বেয়ারাকে নির্দেশ দিল এমিলিয়াকে ডেকে আনারজন্যে।

অল্পক্ষণ পরেই এমিলিয়া এসে ড্রইং রুমে প্রবেশ করল। লাল লম্বা স্কার্ট পরা, মাথায় রুমাল।

ডেভিড সালেম বলল, এস মা।

ডোবিন এমিলিয়ার দিকে মুখ তুলে হেসে বলল, বস মা, কেমন আছ?

-ভাল। আপনি কেমন আছেন, চাচাজান?

-আছি একরকম, খুব ভাল কি থাকতে পারছি।

এমিলিয়া সোফায় তার পিতার পাশে বসল।

মুহূর্ত কয়েক সবাই চুপচাপ।

নীরবতা ভাঙ্গল প্রথমে এমিলিয়ার পিতাই। বলল, তোমার চাচা ডোবিন তোমাকে কয়েকটা কথা জিজ্ঞেস করবে এমি।

বলে ডোবিনের দিকে তাকিয়ে বলল, তোমার কথা শুরু কর ডোবিন।

এমিলিয়া চকিতে একবার পিতার দিকে তাকাল। একটা সন্দেহ, বিশেষ করে ডোবিনকে এভাবে দেখে, তার মনে ঝিলিক দিয়ে গেল। সেই সাথে একটা শংকাও দেখা দিল তার মনে। বোধ হয় চোখে মুখে তার একটা অস্বস্থির ছাপও ফুঠে উঠল।

কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যই। ঘটনার কথা স্মরণ করতে গিয়ে তার হৃদয়ে ভেসে উঠল মাহমুদের মুখ। প্রশান্তিতে ভরে উঠল এমিলিয়ার বুকটা। ওঁর কাজে লাগতে পেরেছে এমিলিয়া এর চেয়ে বড় তৃপ্তি তার কাছে আর কিছু নেই।

ডেভিড সালেমের কথায় ডোবিন একটু নড়ে-চড়ে বসল। একটু সামনে ঝুকে বসে জিজ্ঞেস করল, মা এমিলিয়া তুমি তো স্মার্থার কাছ থেকে কোড ডিসাইফার নিয়েছিলে তাই না? এমিলিয়া শান্তভাবে জবাব দিল, জি, নিয়েছিলাম।

-এনে ক'দিন রেখেছিলে?

-বাসায় আনিনি?

-তাহলে?

-স্মার্থার বাসায়ই আমি ওটা দেখেছি। এমিলিয়ার জবাবে ডেভিড সালেমের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

ডেভিড আবার জিজ্ঞেস করল, তুমি কি গোটা বইটা পড়েছিলে?

-হাঁ গোটা বইটাই আমি দেখেছি।

ডোবিন একটু চুপ করে থাকল। তারপর মুখ তুলে তাকাল এমিলিয়ার দিকে। বলল, তুমি কি বইটার ফটো নিয়েছিলে? ডেভিড সালেমেরও স্থির দৃষ্টি এমিলিয়ার দিকে। তার চোখে কিঞ্চিত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার ছাপ।

প্রশ্ন শুনে এমিলিয়ার মুখ একটু নীচু হলো। একটা বিমর্ষতার ছাপ ফুটে উঠল তার চোখে মুখে। বাইরে শান্ত দেখালেও বুকটা তার তোলপাড় করছিল। কি

উত্তর দেবে সে? পিতা, দাদার মর্যাদার কথা সে জানে। নিজের জন্য তার কিছু ভয় নেই, কিন্তু তার এ স্বীকৃতিতে পিতার এবং দাদার মান মর্যাদা ধূলায় লুটিয়ে পড়বে, এই কথা তার কাছে খুব বড় হয়ে উঠল। তাহলে সে কি করবে? মিথ্যা কথা বলবে? জ্বলজ্যান্ত মিথ্যা কথা সে বলবে কেমন করে? তার প্রিয়তম মাহমুদের কথা তার মনে পড়ল। এ অবস্থায় সে কি করত? নিশ্চয়ই তার মত নীতি-নিষ্ঠ মানুষের মিথ্যা বলার প্রশ্নই উঠে না। যদি তাই হয় তাহলে তার এমিলিয়া জীবনের ভয়ে, বংশ মর্যাদার ভয়ে মিথ্যা কথা বলবে কি করে? এমিলিয়া মন শক্ত করল, সিদ্ধান্ত নিয়ে নিল। মুখ না তুলেই ধীর কন্ঠে সে বলল, হ্যাঁ আমি ফটো নিয়েছি?

-ফটো নিয়েছো?

ডেভিড সালেম এবং ডোবিন দু'জনের কণ্ঠই আঁৎকে উঠল।

ডেভিড সালেমের চোখে-মুখে একটা কালোছায়া নেমে এসেছে। সে বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে আছে এমিলিয়ার দিকে। যেন তার বিশ্বাস হতে চাইছে না, এমন কন্ঠে সে দ্রুত জিজ্ঞেস করল, সত্যিই বলছ, তুমি ফটো নিয়েছ?

মুখ না তুলেই এমিলিয়া বলল, জি, আব্বা।

ডেভিড সালেম আর কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারল না। যেন ব্যাপারটা বুঝতে এবং আত্মস্থ হতে তার সময় লাগছে।

এই ফাঁকে ডোবিন জিজ্ঞেস করল ফটোগুলো তোমার কাছে এখন আছে?

-না, নেই।

মুহূর্তে উত্তেজনায় মুখটি লাল হয়ে উঠল ডোবিনের। চঞ্চল হয়ে উঠল সালেমের চোখ-মুখও। এমিলিয়া কিন্তু মুখ তোলেনি। যেভাবে সে মুখ নীচু করে বসেছিল, সেভাবেই বসে থাকল।

ডোবিন আবার জিজ্ঞেস করল কোথায় ফটোগুলো? এবার মুখ তুলে স্পষ্ট কন্ঠে এমিলিয়া বলল, মাহমুদ নামের একজন ওগুলো নিয়ে গেছে?

-মাহমুদ! কে সে, কোথায় থাকে? প্রায় চিৎকার করে উঠল ডোবিনের কণ্ঠ।

আমি তার নাম জানি, কোথায় থাকে জানি না।

এবার ডেভিড সালেম জিজ্ঞাসা করল, কেমন করে, কোথায় তোমার সাথে পরিচয়?

উদ্বেগে যেন ভেঙ্গে পড়তে চাইল ডেভিড সালেমের কণ্ঠস্বর।

এমিলিয়া ধীরকন্ঠে জবাব দিল, একটা দুর্ঘটনার সময় উনি আমাকে রক্ষা করেছিলেন। সেই থেকে পরিচয়। কোথায় থাকেন তার কিছুই আমি জানি না।

ডোবিন ডেভিড সালেমের দিকে একটু চেয়ে এমিলিয়ার দিকে ফিরে আবার জিজ্ঞেস করল, মা এমিলিয়া, তুমি বুদ্ধিমতি, তুমি জান ঐ কোড ডিসাইফারটি শত্রুর হাতে পড়লে ইসরাইল রাষ্ট্রের কি সর্বনাশ হয়ে যাবে। আমরা চাই তার হাত থেকে এই মুহূর্তে ওটা উদ্ধার করি। তুমি তার ঠিকানা দিয়ে আমাদের সাহায্য কর।

চোখে-মুখে এমিলিয়ার একটা অসহায়ত্বের ভাব ফুটে উঠল। বলল, চাচাজান, আমি মিথ্যা কথা বলি না। বলছি, আমি তার ঠিকানা জানিনা।

ভাবছিল ডোবিন মুখ নীচু করে। কিছুপর মাথা তুলে বলল, তার সাথে যোগাযোগ হতো কোথায়, সেটা বলো।

-তার সাথে কোন যোগাযোগ আমি কখনও করিনি। স্পষ্ট কন্ঠে জবাব দিল এমিলিয়া।

মাথা নীচু করে ভাবছিল ডোবিন। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে ডেভিড সালেমের দিকে চেয়ে বলল, স্যার আপনার সাথে একা কথা বলতে চাই।

ডেভিড সালেমের গোটা মুখমন্ডলটা বিধ্বস্ত, বিমূঢ় ও অসহায়ভাব সেখানে। সে এমিলিয়াকে বলল, মা তুমি একটু ভিতরে যাও।

এমিলিয়া চলে গেলে ডোবিন বলল, বলুন স্যার, এখন কি করণীয়?

-আমিও ভাবছি ডোবিন। কেমন করে এ সর্বনাশ হলো বুঝতে পারছিনা।

-আমার মনে হয় স্যার, এমিলিয়া শত্রু পক্ষের গোয়েন্দা নেটওয়ার্কের জালে জড়িয়ে পড়েছে।

চমকে উঠল ডেভিড সালেম। বলল, তুমি কি এ রকমটাই মনে করছ?

-আমার কাছে এখনও কিছু স্পষ্ট নয় স্যার।

ডোবিন একটু থামল, একটু দ্বিধা করল। তারপর বলল, পরিস্থিতি যতদূর গড়িয়েছে তাতে এমিলিয়াকে একবার আমাদের অফিসে যাওয়া দরকার। সকলে যাতে মূতমাইন হতে পারে এ জন্যে সকলের সামনেই তার জিজ্ঞাসাবাদ হওয়া উচিত।

মনে মনে কেঁপে উঠল ডেভিড সালেম। তার অতি আদরের একমাত্র কন্যাকে যেতে হবে সিনবেথ অফিসে। এ যাওয়ার অর্থ সে বুঝে। বুকটা তার মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু সেই সাথে মনে পড়ল রাষ্ট্রের কথা, ইসরাইলী জনগণের কথা, ইহুদী স্বার্থের কথা। আরো মনে হল, অন্যের ক্ষেত্রে হলে এ পরিস্থিতিতে সে কি করত! বড় অসহায় বোধ করল ডেভিড সালেম। পিতৃমন তার কোন যুক্তিই মানতে চায় না। কিন্তু তার পিতৃস্নেহের কি মূল্য! কে এর মূল্য দিবে! সে কি ডোবিনকে বাধা দিতে পারবে? তার পিতৃত্বের অধিকার দিয়ে রাষ্ট্রের অধিকারকে সে কেমন করে ঠেকিয়ে রাখবে! ডেভিড সালেম ডোবিনের দিকে চেয়ে ধীরে ধীরে বলল, এখনি নিয়ে যেতে চাও?

ডোবিনও ডেভিড সালেমের এই অবস্থার সামনে খুবই বিব্রত বোধ করছিল। বলল, তার আগে স্যার আপনারা এমিলিয়াকে একটু বুঝিয়ে দেখুন। মাহমুদের ঠিকানা জানালে ব্যাপারটা সহজ হয়ে যায়।

আবার কেপেঁ উঠল ডেভিড সালেমের মন। ডোবিনরা এ কঠিন পয়েন্টই ধরবে সে জানে। বলল, ঠিক আছে ডোবিন, তুমি আরেকটু বস।

বলে ডেভিড সালেম ভেতরে চলে গেল।

সালেম চলে গেলে ডোবিন টেলিফোন করল অফিসে। টেলিফোনের ওপার থেকে আইজ্যাক কথা বলে উঠল। ডোবিন বলল, আইজাক খবর খারাপ। পাখি আমাদের হাতছাড়া বলে মনে হচ্ছে। ঘটনার মূল এখন এমিলিয়া। তাকে নিয়ে আসছি।

বিস্মিত আইজাক ওপার থেকে কিছু বলতে চাইল। ডোবিন তাকে বাধা দিয়ে বলল, এখন আর কোন কথা নয়। আসি তারপর।

ডোবিন মাথা নীচু করে দাঁড়িয়েছিল গাড়ীর পাশে। এমিলিয়া শান্ত ও স্বাভাবিকভাবে হেটে গিয়ে গাড়ীতে উঠল। তার ইচ্ছা হচ্ছিল পিছন ফিরে একবার মাকে দেখে। কিন্তু সাহস পাচ্ছিল না। মায়ের মুখ সে সহ্য করতে পারবে না। হয়ত সে ভেঙ্গে পড়বে শেষ মুহূর্তে, আর লোকে বলবে আমি ভয়ে কেঁদেছি। তার মনে পড়ল পিতা-মাতার কান্নাজড়িত অনুরোধের কথা। আমি যেন মাহমুদের ঠিকানা বলে দিই, বলে দিয়ে নিজেকে রক্ষা করি, পিতা-মাতার মুখ রক্ষা করি। কিন্তু এ অনুরোধ এমিলিয়া রাখবে কি করে? সে তো আসলেই মাহমুদের ঠিকানা জানে না। এখানেই সবচেয়ে বেশী কষ্ট লাগছে এমিলিয়ার। পিতা-মাতা নিশ্চয়ই মনে করছেন আমি সব জানি, কিন্তু বলছি না। কিন্তু কেমন করে সে তাদের বুঝাবে যে, তাদের এমিলিয়া তাদের সাথে মিথ্যা কথা বলেনি।

ডোবিনের গাড়ী এমিলিয়াকে নিয়ে চলে গেল। এমিলিয়ার মা আইরিনা টলতে টলতে বাড়ীর ভেতরে প্রবেশ করল। চলে গেল শোবার ঘরে।

ওখানে এমিলিয়ার পিতা ডেভিড সালেম চেয়ারে বসে গালে হাত দিয়ে বাইরে তাকিয়েছিল। কাঁচের জানালা দিয়ে তার দু'টি চোখ কোথায় হারিয়ে গিয়েছিল কে জানে।

আইরিনা তার গায়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ে ডুকরে কেঁদে উঠল। তুমি কোন কিছু বললে না, কেন যেতে দিলে আমার এমিলিয়াকে? কেন কেন, কেন!

ডেভিড সালেম কিছুই বলল না। যেমন বসেছিল তেমনি বসে রইল। ঠিক বোবা মানুষের মত।

আইরিনা ডেভিড সালেমের গা থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল মেঝেতে।

ডেভিড সালেম উঠে আইরিনাকে তুলে বলল, ধৈর্য ধর আইরিনা, ইহুদীরা আমরা ইসরাইলের স্বার্থকেই সবার ওপর স্থান দিয়েছি।

-মানি না এ কথা।

-মানতে হবে আইরিনা, ব্যক্তির জন্যে দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেব কেমন করে?

-দেশের স্বার্থ বিকিয়ে দেবার প্রশ্ন কেন, আমার এমিলিয়া নির্দোষ।

-তুমি বললেই তো সবাই একথা বলবে না আইরিনা!

-আমার এমিলিয়া যা জানে সত্য সত্যই সব বলেছে!

-সত্য বলেই তো আরো জড়িয়ে পড়েছে!

আইরিনা আবার ফুপিয়ে কেঁদে উঠল, না, আমি এসব কিছু বুঝি না। প্রধানমন্ত্রী তোমার পিতার লোক, তাকে তুমি বল, আমার এমিলিয়াকে ফিরিয়ে আন।

ডেভিড সালেম আইরিনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, আমাকে এ অনুরোধ করো না, আমি এ কথা তাকে বলতে পারবো না।

এক ঝটকায় উঠে দাঁড়াল আইরিনা। চিৎকার করে বলল, তুমি এত নিষ্ঠুর। তুমি পিতা না? তুমি কি জান না, সিনবেথ কোন নরপশুদের আড্ডা?

বলে কান্না চাপতে চাপতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে গেল আইরিনা।

চেয়ারে ফিরে এল সালেম। আইরিনার শেষ কথাগুলো প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল তার অন্তরে, তুমি পিতা না? তুমি জান না, সিনবেথ কোন নরপশুদের আড্ডা?

অন্তরটা তারও হাহাকার করে উঠল। এমিলিয়ার অসহায় মুখটি ভেসে উঠল তার চোখে। দু'চোখ ফেটে তার নেমে এল অশ্রু, মাথাটা নুয়ে পড়ল টেবিলে। অবরুদ্ধ কান্নার বাঁধভাঙ্গা উচ্ছাসে কেঁপে উঠতে লাগল তার শরীর।

ইসরাইলের আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সার্ভিস 'সিনবেথ' -এর নির্যাতন সেল। অন্ধকূপের মত সেলটি। দুই হাতের বেশী প্রশস্ত নয়। পাথুরে দেয়াল। একটি মাত্র লোহার দরজা বাইরে থেকে বন্ধ। কোন জানালা নেই। বহু উঁচুতে দেয়ালের ঘুলঘুলি দিয়ে একখণ্ড আলো এসে বিপরীত দিকের দেয়ালে পড়েছে। সেলের ঘুটঘুটে অন্ধকারের বুকে ঐ গোলাকার আলোক খণ্ডকে মনে হচ্ছে যেন কারও দৈত্যাকার রক্ত চক্ষু।

জ্ঞান ফিরে পেয়েছে এমিলিয়া অনেকক্ষণ। সারা গায়ে অসহ্য বেদনা। হাত ও পায়ের আঙ্গুল তীব্র যন্ত্রণায় খসে যাচ্ছে যেন। হাত ও পায়ের আঙ্গুলে সুচ ফুটানোর দুঃসহ স্মৃতি তার সামনে এল। শিউরে উঠল সে। উঃ ! কি সে বর্বরতা !!

কিন্তু সব বেদনা, সব যন্ত্রণা ছাপিয়ে উঠেছে তার তৃষ্ণা গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। তৃষ্ণায় ফেটে যাচ্ছে বুক। যেন এক সাগর পানি হলেও এ তৃষ্ণা মিটবে না। দিন কি রাত বোঝা যাচ্ছে না। কোথা থেকে যেন একটা খট্ খট্ শব্দ কানে এল। ভারী বুট পায়ে কে যেন হেটে যাচ্ছে। তৃষ্ণা অসহ্য হয়ে উঠলো তার। যন্ত্রণায় কঁকিয়ে উঠল সে। তার মুখ ফেটে চিৎকার বেরুলোঃ পানি, পানি, পানি......।

এই সময় খট্ করে খুলে গেল সেলের লৌহ দরজা। প্রবেশ করল 'সিনবেথ'-এর আই, ও (Indoor Operation) বিভাগের প্রধান জন স্যামুয়েল। তার সাথে আর একজন লোক। নাম সলোমন। হাতে তার একটি জগ ও একটি গ্লাস।

পানি দেখে উন্মুখ হয়ে উঠল এমিলিয়া। তার চোখের কোণে আশার আলো চিক চিক করে উঠল। এই মুহূর্তে তার কাছে পানির চেয়ে বড় কিছু পৃথিবীতে নেই।

মিঃ স্যামুয়েল দাঁড়িয়েই বললেন, 'মিস পলিন ফ্রেডম্যান, আপনি কি মনস্থির করতে পেরেছেন?

প্রশ্নের কোন উত্তর না দিয়ে এমিলিয়া বলল, আমাকে পানি দিন।

-আমি দুঃখিত মিস পলিন, আপনি আমাদের সাহায্য না করলে আমরা কেমন করে আপনাকে সাহায্য করতে পারি? নির্বিকার কন্ঠে বলল স্যামুয়েল।

-কি সাহায্য আমি করতে পারি? আমি তো বলেছি, সাইমুমের কারও পরিচয় আমি জানি না। কোন ঠিকানা তাদের আমার জানা নেই।

-আপনি তাদের কোন খবর রাখেন না? হাসালেন মিস পলিন।

-বিশ্বাস করুন আমাকে। কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এমিলিয়া।

-আপনি আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্র জাতির অনতম প্রতিষ্ঠাতা মৃত ডেভিড বেনগুরিয়ানের নাতনি। আপনার প্রতি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা আছে বলেই আপনার কাছ থেকে কথা বের করতে আমাদের এত দেরী হচেছ। কিন্তু আর দেরী আমরা করতে পারি না, আপনি আমাদের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার মর্যাদা রাখেননি।

এমিলিয়া মাথা নীচু করেছিল। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছে। চোখ দিয়ে অবিরাম ধারায় নামছে পানি। সে ধীরে ধীরে চোখ মুছে ফেলল। ভাবল, এদের কাছে অনুগ্রহ ভিক্ষা করে কোন লাভ নেই, কোন কথাই এরা বিশ্বাস করবে না। যত কষ্টই হোক, মৃত্যুর সীমা পেরিয়ে তো আর কিছু ঘটবে না।

মিঃ স্যামুয়েল কিছুক্ষণ থেমে আবার বলল, আপনাকে ভাববার জন্য ১০ মিনিট সময় দিচ্ছি। এর মধ্যে আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী না হলে ভয়াবহ পরিণতির সম্মুখীন আপনাকে হতে হবে। তড়িৎ আসনের নাম শুনেছেন নিশ্চয়?

তড়িৎ আসনের কথা শুনতেই আতংকে শিউরে উঠল এমিলিয়ার গোটা দেহ। কিন্তু নিজেকে সামলে নিল সে। বলল, ১০ মিনিট কেন ১০ দিন সময় দিলেও আমার ঐ একই কথা মিঃ স্যামুয়েল। আমি যা জানি না তা বলতে পারব না।

কোন কথা না বলে মিঃ জন স্যামুয়েল বের হয়ে গেল। তার সঙ্গে সঙ্গে বের হয়ে গেল পানিওয়ালা সলোমন। এমিলিয়ার চোখে পড়ল, পানিওয়ালা যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল, সেখানে মেঝের উপর খানিকটা পানি জমে আছে -ফোঁটা ফোটাঁ করে পড়েছিল জগ থেকে। এমিলিয়া এগিয়ে গেল পানির দিকে এক সমুদ্র তৃষ্ণা নিয়ে। দরজা এই সময় বন্ধ হয়ে গেল। অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। এমিলিয়া

হুমড়ি খেয়ে পড়ল পানির উপর। মাটিতে ঠোঁট ঠেকিয়ে শুষে নিল পানিটুকু। গলা জিহ্বা এতে ভিজল বটে কিন্তু আরো তীব্র হয়ে উঠল তৃষ্ণার জ্বালা। মেঝে থেকে পানির শেষ চিহ্নটুকু জিহবা দিয়ে শুষে নিয়ে কান্নায় লুটিয়ে পড়ল এমিলিয়া। অনেকক্ষণ ধরে কাঁদল সে। মনে পড়ল মাহমুদের কথা। সে কি জানতে পেরেছে তার এই অবস্থা। সে কি আর কোন দিন বেরুতে পারবে এই মৃত্যুপুরী থেকে? দেখতে পাবে কি আর মাহমুদকে?

বাইরে ভারি বুটের শব্দ হল। তালা খোলার শব্দ শোনা গেল। তারপর খট্ করে খুলে গেল দরজা। প্রবেশ করল সেই মিঃ জন স্যামুয়েল। দরজায় দাঁড়িয়ে থাকল আরও দু'জন। মিঃ স্যামুয়েল একই ধরনের প্রশ্ন পুনরায় আওড়ালো। আপনি কি মন স্থির করতে পেরেছেন মিস পলিন?

এমিলিয়া এই নিরর্থক প্রশ্নের কোন জবাব দিল না। মিঃ জন স্যামুয়েল পুনরায় বলল, চরম পথ বেছে নিতে আমাদেরকে আপনিই বাধ্য করলেন মিস পলিন।

-যে পথই আপনারা গ্রহণ করুন, যা জানা নেই, তা আপনারা বের করতে পারবেন না। বলল এমিলিয়া।

-এ রকম কথা আমরা বহু শুনেছি, বহু জনের কাছে। কিন্তু শেষে বলতে তারা বাধ্য হয়েছে। বলে একটু থেমে দরজায় দাঁড়ানো দু'জনকে বলল, একে নিয়ে চল অপারেশন রুমে। বলে সে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

লোক দু'টি ঘরে ঢুকতেই এমিলিয়া অতি কষ্টে স্বেচ্ছায় উঠে দাঁড়ালো। দরজার সামনে রাখা স্ট্রেচারে শুয়ে পড়ল সে। লোক দু'জন ধরাধরি করে নিয়ে চলল স্ট্রেচার।

বাইরের খোলা বাতাস বুক ভরে গ্রহণ করল এমিলিয়া। কোথায় তাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তা সে জানে। এক মহা আতংক এসে তার বুকে চেপে বসতে চাইছে। মনকে হালকা করতে চাইল সে। তাকে লম্বা বারান্দা দিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বারান্দার পাশ দিয়ে এক ফালি নীল আকাশ দেখা যাচ্ছে। নীশ আকাশের বুকে একখন্ড সাদা মেঘ কোন অজানার পথে পাড়ি জমিয়েছে। বেদনায় মোচড় দিয়ে উঠল এমিলিয়ার বুক। হায়রে মুক্ত জীবন।

হঠাৎ নীল আকাশ কোথায় হারিয়ে গেল। তাকে প্রবেশ করানো হলো একটি ঘরে, সে ঘর থেকে আর একটি ঘর। এ ঘর থেকে একটি সংকীর্ণ সিঁড়ি নেমে গেছে ভূগর্ভে। ভূগর্ভের সিঁড়ি দিয়ে এমিলিয়াকে নিয়ে পৌঁছানো হলো একটি প্রশস্ত কক্ষে। সেখানে আগে থেকেই উপস্থিতি ছিল মিঃ জন স্যামুয়েল এবং আরও দু'জন লোক। স্ট্রেচার সমেত এমিলিয়াকে রেখে বাহকরা ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ঘরটি। আসবাব বাহুল্য নেই। চারদিকে পাথরের দেয়াল। উত্তর দিকের দেয়ালে লোহার গরাদে ঢাকা একটি স্থান। মনে হলো জানালা। ঘরের ঠিক মাঝখানে কয়েক ইঞ্চি উঁচু একটি বেদীর উপর লম্বা ও সুদৃঢ় একটি কাঠের পাটাতন। পাটাতনের দু'পাশ থেকে দু'টি করে চামড়ার মোটা বেল্ট বের হয়ে এসেছে। পাটাতনের উপর পড়ে আছে একটি ইলেকট্রিক ম্যাগনেটো। জ্বলজ্বল করছে তার উপর সাদা দু'টি বোতাম। পাশেই সুইচ বোর্ড। ওদিকে একবার চেয়েই বুঝতে পালো-সেটা কি। এমিলিয়ার প্রতিটি স্নায়ুতন্ত্রী, প্রতিটি রক্ত কণিকায় যন্ত্রণার উষ্ণ স্রোত বয়ে গেল। সে মন শক্ত করতে চেষ্টা করল, মৃত্যুর পরপারে তো আর এ যন্ত্রণা পৌঁছবে না।

এই সময় মিঃ স্যামুয়েল এমিলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, 'সময় আছে এখনও মিস পলিন। আপনি সচেতন, আপনি শিক্ষিতা। আপনার সামনে রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক কষ্টের মধ্যে দিয়ে তিলে তিলে মৃত্যু, আর ক্ষমা এবং সুখ স্বাচ্ছন্দপূর্ণ জীবন। আপনি কোনটি করবেন, আপনিই ভেবে দেখুন।

এমিলিয়া মিঃ স্যামুয়েলের দিকে চেয়ে স্পষ্ট কন্ঠে বলল, সাইমুমের লোকজনদের পরিচয় ঠিকানা জানলেও আমি বলতাম কি না জানি না, তবে আমি আগেও বলেছি আবার বলছি তাদের কারও পরিচয়, ঠিকানা আমি জানি না।

সাপের মত ঠান্ডা এক হাসি টেনে নিরুত্তাপ স্বরে বলল মিঃ স্যামুয়েল, 'আমি তা জানি মিস পলিন। আমাদের আগেই বোঝা উচিত ছিল, আজকাল মেয়ে স্পাইরাই সবচেয়ে কঠিন হয়ে থাকে গত দু'দিনের অভিজ্ঞতায় আপনাকে দিয়েই এ বোধটা আমাদের মনে নতুন করে জাগল।' বলে সে উঠে দাঁড়ালো।

উঠে গরাদ-ঢাকা সেই স্থানটিতে গিয়ে দাঁড়াল। একটি ছোট্ট হাতল ঘুরিয়ে গরাদ খুলে ফেলল। উন্মুক্ত হল একটি জানালা পথ। সে এমিলিয়ার দিকে চেয়ে বলল, আসুন মিস পলিন, দেখুন।

যন্ত্র-চালিতের মত উঠে গিয়ে স্যামুয়েলের পাশে দাঁড়াল এমিলিয়া। স্যামুয়েল জানালার পাশে একটা বোতামে চাপ দিল। অমনি জানালার বাইরের অন্ধকার সরে গেল। জানালার পাশ দিয়ে চলে যাওয়া সুগভীর পয়ঃপ্রণালী স্পষ্ট হয়ে উঠল। পয়ঃপ্রণালীর দু'পাশ দিয়ে প্রশস্ত করিডোর। মিঃ স্যামুয়েল সামনের করিডোরের দিকে ইঙ্গিত করে বলল, 'চেয়ে দেখুন।'

এমিলিয়া তাঁর ইঙ্গিত অনুসরণ করে চেয়ে দেখল, নরমুন্ডের বিরাট স্তুপ।

স্যামুয়েল বলল, আমরা এই কক্ষে সহজে কাউকে আনি না। কেউ আসলে সে আর ফিরে যায় না। ঐ নরমুন্ডের স্তুপই তার প্রমান। তড়িৎ আসন ব্যর্থ হলে ঐ নরমুন্ডের মিছিলে তার স্থান।

এমন দৃশ্যের সম্মুখীন হলে আগে সে হয়ত ভয়ে ভিমরি খেয়ে যেতো, কিন্তু আজ তার সে অবস্থা নেই। অনুভূতি তার যেন ভোঁতা হয়ে গেছে। কোন উত্তর দিল না সে মিঃ স্যামুয়েলের কথার।

মিঃ স্যামুয়েল জানালা বন্ধ করে দিল। তারপর যন্ত্রের মত দাঁড়ানো লোক দু'জন একজনকে সম্বোধন করে বলল, 'আইজাক, অধিবেশনের কাজ শুরু কর' বলে সে ঘরের চেয়ারটিতে গিয়ে বসল।

এমিলিয়ার দিকে এগিয়ে এল আইজাক। কেঁপে উঠল এমিলিয়ার বুক। আইজাকের ইঙ্গিতে যন্ত্রচালিতের মত শুয়ে পড়ল এমিলিয়া পাটাতনের উপর। থর থর করে কাঁপছে গোটা শরীর। গলা-জিহ্বা শুকিয়ে কাঠ হয়ে আছে। প্রকট হয়ে উঠল বুক-ফাটা তৃষ্ণা। এমিলিয়া স্থির করেছিল, কোন অনুরোধ কাউকে করবে না সে। কিন্তু পারল না। মুখ থেকে আপনিই বেরিয়ে গেল পানি, পানি দাও।

দু'পাশ থেকে চামড়ার বেল্ট শক্ত করে বেঁধে ফেলেছিল এমিলিয়াকে। শরীরটা পাটাতনের সাথে এক হয়ে গেছে, নড়বার শক্তি ছিল না এতটুকুও। চেয়ারে বসেই কথা ছুঁড়ে মারল স্যামুয়েল, সাহায্য করতে পারলাম না বলে দুঃখিত মিস পলিন।

এমিলিয়ার দু'চোখ থেকে কানের দু'পাশ দিয়ে নেমে এল অশ্রুর দু'টি ধারা। তার শুকনো জিহ্বা আর শুকনো ঠোঁট থেকে অষ্ফুটে বেরুলো, আল্লাহ, তুমি সর্বশক্তিমান সবার উপর ক্ষমতাশালী তুমি।

এমিলিয়ার মুখে গুঁজে দেয়া হলো বড় একটি কাপড়। তার কিছু অংশ পোটলা হয়ে মুখের ভিতরে থাকলো, কিছু অংশ থাকলো বাইরে।

সকল প্রস্তুতি শেষ করে ইলেকট্রিক ম্যাগনেটোর সাথে কানেকশন নেয়া হলো সুইচ বোর্ডের। অন করল সুইচ। আইজাক ছোট্ট করে চাপ দিল ম্যাগনেটোর একটি বোতামে। গোটা দেহ হঠাৎ খিচুনী দিয়ে উঠলো এমিলিয়ার। অষ্ফুট গোঙ্গানী বেরুলো মুখ থেকে। চোখ দু'টি তার বিষ্ফোরিত হলো। বোতাম থেকে হাত উঠিয়ে নিল আইজাক।

দেহের খিচুনী থেমে গেল। কিন্তু গোঙ্গানী থামল না। হাঁপাচ্ছে এমিলিয়া। তার ঠোঁট কাঁপছে, চোখের পাতা কাঁপছে, থর থর করে কাঁপছে তার গোটা দেহ।

এবার বোতামে চাপ দিল আইজাক। আবার শুরু হলো সেই খিচুনী, ফুলে ফুলে উঠছে গোটা শরীর। চোখ দু'টি বিষ্ফোরিত হয়ে বের হয়ে আসছে যেন। চামড়ার বেল্ট কেটে বসে যাচ্ছে শরীরে।

এমিলিয়ার শরীরে ছড়িয়ে পড়েছে যন্ত্রণার এক ভয়াবহ আগুন। প্রতিটি মাংসপেশীর প্রতিটি কণিকাকে যেন কেটে কেটে পৃথক করে দিচ্ছে, আর সেই কণিকাগুলোকে ঝাঝরা করে দিচ্ছে আগুনের অসংখ্য সূঁচ।

চোখের প্রতিটি মাংস কণিকা যেন খন্ড খন্ড হয়ে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ছে। সর্বশক্তি দিয়ে কামড়ে ধরেছে মুখে গুঁজে দেয়া কাপড়। দাঁতগুলো কেটে বসে গেছে কাপড়ে। অসহ্য যন্ত্রণা চেতনার প্রান্তসীমায় নিয়ে গেল এমিলিয়াকে। জ্ঞান হারিয়ে ফেলল সে।

সিনবেথ হেড কোয়ার্টারের বেয়ারা সলোমন। আজ পচিঁশ বছর হলো আছে সে এই চাকুরীতে। বয়স তার এখন পঞ্চাশ। জীবনের পঁচিশ বছর সে কাটিয়েছে বীরশিবায়। বীরশিবা তার জন্মস্থান।

তৃষ্ণার্ত এমিলিয়াকে পেছনে রেখে যখন সে সেল থেকে বের হয়ে আসছিল তখন তার মন গিয়ে পড়েছিল বীরশিবায়। তার চোখে ভেসে উঠেছিল এমনি একটি দৃশ্য। প্রায় পঁচিশ ছাব্বিশ বছর আগের কথা। বীরশিবা তখন একটি সমৃদ্ধ মুসলিম জনপদ। মুসলিম মহল্লারই একপ্রান্তে ছিল সলোমনদের বাড়ী। তারই ছিল বীরশিবার একমাত্র ইহুদী পরিবার। সুখে দুঃখে একাত্ম হয়েছিল তারা মুসলমানদের সাথে। হঠাৎ ওলট-পালট হয়ে গেল সব। দলে দলে এল ইহুদী। কেউ রাশিয়ার, কেউ জার্মানীর, কেউ আমেরিকার। উচ্ছেদ করা হলো মুসলমানদের। সে কি নির্মম দৃশ্য। মুমূর্ষ মানুষের কত করুণ আকুতি সে দেখেছে। মনে পড়ে সলোমনের এমনি একজন প্রতিবেশী মুমূর্ষ মানুষের মুখে পানি তুলে দিতে গিয়ে নবাগত মারমুখো ইহুদীদের হাতে সে কেমনভাবে লাঞ্ছিত হয়েছিল। তার চোখের সামনেই বুক ভরা পিপাসা নিয়ে তার মুমূর্ষ প্রতিবেশী চিরতরে চোখ মুদেছিল। আজ পিপাসাকাতর এমিলিয়ার মুখ দেখবার পর তারই কথা মনে হচ্ছিল সলোমনের। সলোমন রাজনীতি করে না, রাজনীতি বোঝে না। সকল নির্যাতনের বিরোধী সে। সাধ্য থাকলে ওই ফুলের মত মেয়েটিকে সে এদের হাত থেকে বাঁচাতো। সে জানে মেঝেতে ফেলা ঐ কয়েক ফোঁটা পানি এমিলিয়ার তৃষ্ণা মেটাতে পারবে না, তবু মনকে প্রবোধ দেয়ার জন্যই সে তা করেছিল।

বারটায় ডিউটি শেষে যখন সে অফিস থেকে বেরুচ্ছিল, তখন এমিলিয়ার চিন্তা তার সারা মন জুড়ে ছিল। ডেভিড বেনগুরিয়ানের মত লোকের নাতনি কি-ই বা এমন অপরাধ করেছে। অপারেশন রুমে মেয়েটি নির্ঘাত নরপশুদের অত্যাচারে মারা পড়বে।

মরদেশাই রোডের এক বাড়ীতে বাস করে সলোমন। তার বাড়ীর পাশেই একটি ফলের দোকান। দোকানের মালিক বৃদ্ধ খলিল শেখ। সলোমনের বন্ধু। বৃদ্ধ খলিলের বাড়ী ছিল জেরুজালেমের নিকট বিরসুবিরে। তার শশুর বাড়ী ছিল বীরশিবায়। সে যেত মাঝে মাঝে সেখানে। সেই থেকেই তার সাথে সলোমনের

পরিচয়। সলোমন তার অবসর সময়ের অধিকাংশই খলিলের দোকানে আড্ডা দিয়ে কাটায়। সলোমন ফিলিস্তিনে বহিরাগত ইহুদীদের বাড়াবাড়ি কোন দিনই পছন্দ করতে পারেনি। এ বিষয়ে দু'জনের মধ্যে পূর্ণ ঐক্যমত রয়েছে। এ নিয়ে কত আলোচনা আর কত অভিজ্ঞতা বিনিময় হয় দু'জনার মধ্যে। বহিরাগত ইহুদীদের বিরুদ্ধে সলোমনের সবচেয়ে বড় অভিযোগ হলো, "ওরা বাইরে থেকে উড়ে এসে দেশের সমস্ত বড় বড় চাকুরী ও সম্পদ-সম্পত্তিতে জুড়ে বসেছে, আর মুষ্টিমেয় স্থানীয় ইহুদীরা চাপরাশী, কেরানী ও মুটে-মজুরের জীবন যাপন করছে।"

এ দিনও সলোমন অফিস থেকে ফিরে খাওয়া সেরে খলিলের ফলের দোকানে গিয়ে দেখা দিল। সলোমনকে দেখেই খলিল আগ বাড়িয়ে বলল, এস, এস, কেমন আছ?

-আর থাকা! মন বড় ভাল লাগছে না।

-কেন, কিছু হয়েছে বাড়ীতে? উদ্বিগ্ন খলিল।

-বাড়ীতে আর কি হবে, ঐ অফিসের কথাই বলছি!

-অফিসে আবার তোমার কি হলো?

-আমার আবার কি হবে? রোজ রোজ কি ঐসব দেখা যায়। আজ আবার বেনগুরিয়ানের নাতনিটিকে ধরে নিয়ে গেছে। এতটুকু এক মেয়ের উপর উঃ! কি অত্যাচার !! দু'দিন থেকে মেয়েটাকে পানিও খেতে দেয়নি।

সলোমনের কথা শুনে চমকে উঠলো খলিল। কিন্তু সামলে নিল নিজেকে। স্বাভাবিক কন্ঠে বলল, খুব মায়া হচ্ছে না?

-মায়া! সাধ্য থাকলে মেয়েটাকে নরপশুদের হাত থেকে ছিনিয়ে আনতাম।

-মানুষের অসাধ্য কিছু আছে নাকি? হেসে বলল খলিল।

-অসাধ্য কিছু নেই। আমিও তা জানি। আমিও পারি, বাঁচাতে পারি মেয়েটাকে। কিন্তু কি লাভ হবে তাতে? সিনবেথের হাত থেকে পরে সেও বাঁচবে না, আমিও বাঁচব না।

মনে মনে অধীর হয়ে উঠেছে, উত্তেজিত হয়ে উঠেছে খলিল। তবু শান্ত কন্ঠে সে বলল, তা ঠিক বলেছ। অর্থহীন ঝুঁকি নিয়ে কি লাভ?

এইভাবে খলিল ও সলোমনের মধ্যে গল্পের যে শুরু হলো, তা প্রতিদিনের রীতিমত নিরবচ্ছিন্নভাবে চল্লই কিন্তু প্রতিদিনের মত খলিল গল্পে মন বসাতে পারছিল না। এক সময় সে বলল, সলোমন তুমি বস, খবরের কাগজগুলো দেখ। আমি মিনিট পনের পর আসছি।

সলোমন বলল, আমিও উঠি খলিল, একটু স্টেডিয়ামের দিকে যাব। বেশ ভাল খেলা আছে আজ। বলত, তোমার টিকিটও কেটে রাখব।

খলিল বলল, আজ বোধ হয় সময় পাব না সলোমন।

সলোমন উঠে যেতেই খলিল ভিতরে ঢুকে গেল। পার্শ্বের ঘরে বসার একটি বেদী উল্টিয়ে একটি গোপন সিঁড়ি পথ ধরে নীচে নেমে গেল সে। খলিল সাইমুমের তেলআবিবস্থ ৪নং ঘটির একজন দায়িত্বশীল ব্যাক্তি। ওয়াজম্যান রোডের ৪নং ঘাটির সাথে একটি গোপন সুড়ঙ্গ দ্বারা সংযুক্ত। মরদেশাই রোডের এই ফলের দোকানের পরিচালনার ভার তারই হাতে রয়েছে।

গ্রীণ লজ। তার একটি কক্ষে পা এলিয়ে বসে ছিল মাহমুদ। সামনে জানালা দিয়ে জলপাই গাছের মাথার ওপর দিয়ে দেখা যাচ্ছে একখন্ড নীল আকাশ। ঘন সবুজ জলপাই গাছের মাথায় যেন নীলের প্রলেপ।

কিন্তু কিছুতেই মন নেই মাহমুদের। কাল রাত থেকে সে ভাবছে। ক্ষত-বিক্ষত হচ্ছে সে এক অসহ্য যন্ত্রণায়। কিন্তু এ যন্ত্রণা কাউকে জানানোর নয়। এমিলিয়াকে সে ভালবাসে। এ ভালবাসাই তাকে দুর্বল করে দিচ্ছে, শুষে নিচ্ছে শক্তি ও উদ্যম। ইসরাইলী বর্বরতার হাত থেকে ওকে বের করে আনতে হলে ঝুঁকি নেয়া প্রয়োজন। কিন্তু তার এমিলিয়ার জন্য সহকর্মীদের মূল্যবান জীবনকে সে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে কেন?

তেলআবিবের সকল সাইমুম-সদস্যদের মধ্যেও এসেছে ভাবান্তর। এমিলিয়ার ঘটনা সকলের মনকেই পীড়া দিচ্ছে। তারা সকলেই অপেক্ষা করছে

নির্দেশের, কিন্তু পাথরের মত নীরব-নিস্পন্দ মাহমুদের কাছ থেকে কোন সাড়া তারা পায়নি।

চিন্তার অথৈ স্রোতে ডুবে গিয়েছিল মাহমুদ। পায়ের শব্দে চমকে দরজার দিকে চোখ ফিরালো সে। দেখল, রায়হান ঘরে ঢুকছে। রায়হানকে দেখে সোজা হয়ে বসে মাহমুদ বলল, কোন মেসেজ রায়হান?

-হেড কোয়ার্টার থেকে আপনার কল, মুসা ভাই কথা বলবেন।

লাফ দিয়ে উঠল মাহমুদ। খুব গুরুত্বপূর্ণ না হলে আহমদ মুসা লাইনে আসে না, মেসেজ পাঠায়। মাহমুদ দ্রুত রেডিও রুমে চলল।

সালাম বিনিময়ের পর প্রথমেই জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা, এমিলিয়ার খবর কি?

-পরবর্তী কোন খবর আর পাইনি।

-কোথায় রেখেছে তাকে?

-বোধ হয় কারাগারে।

-বোধ হয় কেন? এ খবরটুকুও নেওনি?

মাহমুদ নীরব। কি জবাব দেবে সে? কি বোঝাবে, কেমন করে সে বোঝাবে আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসা বোধ হয় আঁচ করতে পারল মাহমুদের অবস্থা। সেও আনমনা হয়ে পড়ল। অনেক আগে ফেলে আসা এক অতীতে হারিয়ে গেল সে। হিমালয়ের এক অন্ধকার গুহায় ফেলে আসা ফারজানার মুখটি অনেকদিন পর আজ তার চোখে ভেসে উঠল। আহমদ মুসা ধীর স্বরে ডাকল, মাহমুদ!

-জি! উত্তর দিল মাহমুদ।

-তোমার দুর্বলতা ঢাকতে গিয়ে, একটি জীবনকে তুমি এক অসহ্য যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিবে, তা তো আমি ধারণা করতে পারিনি। তুমি কি জান না, ইসরাইলের Indoor Operation-এর শয়তানরা কত নরপশু।

কেঁপে উঠলো মাহমুদ। তার গোটা শরীরে ছড়িয়ে পড়ল অসহ্য এক যন্ত্রণা। কোন জবাব দিতে পারল না সে।

আহমদ মুসা আবার বলল, শোন আমার নির্দেশ, যে কোন মূল্যে এমিলিয়াকে বাঁচাতে হবে। সে আমাদেরই একজন। তার প্রতি আমাদের দায়িত্ব আছে। আমাদের জন্য সে যা করেছে, তা আমরা কেউই ভুলতে পারিনা।

আপনার আদেশ আমরা পালন করব জনাব। ধীর কন্ঠে বলল মাহমুদ। তার চোখে মুখে দৃঢ় সংকল্পের ছাপ।

-আর শোন, আগামী ২৫শে ফেব্রুয়ারী মিসর, সিরিয়া, জর্দান ও লেবাননের সঙ্গে ইসরাইলের শান্তি-চুক্তি স্বাক্ষরিত হচ্ছে। আর ২৭ শে ফেব্রুয়ারী ইসরাইলের 'সাবাত দিবস'। আজ থেকে ঠিক ১ মাস ১ দিন পর। ইনশাআল্লাহ ঐ দিনটিই হবে ইসরাইল রাষ্ট্রের শেষ আনন্দের দিন। আমি ১১ ই ফেব্রুয়ারী ইসরাইলের শেষ কৃত্যের জন্য তেলআবিব আসছি।

মাহমুদ রেডিও রুম থেকে বেরিয়ে ঘরে প্রবেশ করে দেখে শেখ জামাল বসে আছে।

-কি সংবাদ জামাল? মাহমুদ বলল।

-এইমাত্র কিছু খবর খলিলের কাছ থেকে পাওয়া গেল।

-কি খবর?

-মিস্ এমিলিয়াকে আজ সকালে সিনবেথের অপারেশন চেম্বারে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। গত দু'দিন তাঁর উপর নির্মম অত্যাচার চলেছে, পানিও খেতে দেয়া হয়নি।

-হুঁ! দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে একটি ছোট্ট জবাব দিল মাহমুদ। এক ঘন্টা সময় আছে, যাও প্রস্তুত হও। শেখ জামাল বেরিয়ে গেল।

মাহমুদ তেলআবিব শহরের মিউনিসিপ্যাল মানচিত্র সামনে নিয়ে গভীরভাবে ভাবছিল।

সুরক্ষিত সিনবেথের অফিস। দক্ষিণ-উত্তর বিলম্বিত হারজেল এভিনিউ থেকে একটা সরু রাস্তা এগিয়ে গেছে পশ্চিমে। এ পথ ধরে শ' দুয়েক গজ এগুলেই নাম-সাইনবোর্ডহীন সিনবেথ অফিসের কারাগার সদৃশ্য প্রধান ফটকে পৌঁছা যায়। সরু রাস্তাটির দু'ধারের বিল্ডিংগুলো নিয়ে আধা সামরিক সিকুউরিটি মিলিশিয়াদের গেরিলা ইউনিটের অফিস। এছাড়া সিনবেথ অফিসের চার দিক ঘিরে মিনিষ্ট্রি অব হোমের নানা বিভাগের অফিস যাকে ডবল প্রটেকটেড এলাকা হিসেবে গণ্য করা হয়।

মাহমুদের কপালে বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছিল। ভেবে পাচ্ছিল না সে এমিলিয়াকে উদ্ধারের পথ কি! রীতিমত যুদ্ধ ছাড়া সিনবেথ অফিসে ঢোকা এবং বের হওয়া অসম্ভব।

অন্য কোন পথ? অন্য পথ আর কি, হেলিকপ্টার নিয়ে সিনবেথ অফিসে গিয়ে হাজির হওয়া।

মাটির তলের কথা মনে হতেই বহুদিন আগে পড়া একটা নিইজের কথা তার মনে পড়ল। চাঞ্চল্যকর খবরটি ছিল দু'টি লাশ নিয়ে। বর্ষাকালে হারজেল এভিনিই-এর ড্রেন পরিষ্কার করার সময় দু'টি লাশ পাওয়া যায়। লাশ দু'টির ফটো বেরোয় পত্রিকায়। অকথ্য শারিরীক নির্যাতনের চিহ্ন ছিল তাদের শরীরে। খবরের কাগজের অনুসন্ধান রিপোর্টে বলা হয়েছিল, দু'সপ্তাহ আগে সিনবেথ লোক দু'টিকে গ্রেপ্তার করে। সিনবেথের নির্যাতনেই তারা মারা যায়। মারা যাবার পর তাদের লাশ ড্রেনে ফেলে দেয়। খবরে উল্লেখ করা হয়, এভাবে লোক হত্যা করে সিনবেথের ভুগর্ভস্থ টর্চার চেম্বার সংলগ্ন ড্রেনে লাশ ফেলে দেয়া সিনবেথের একটা পুরোনো অভ্যাস।

খবরটি মনে পড়ার সাথে সাথে মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল মাহমুদের। মিউনিসিপ্যাল মানচিত্রের উপর আবার সে ঝুঁকে পড়ল।

মানচিত্রে হেড ড্রেনগুলোকে কালো এবং শাখা ও প্রশাখা ড্রেনগুলোকে নীল ও সবুজ লাইন দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। সে লক্ষ্য করল, একটি গভীর কালো রেখা হারজেল রোডের পশ্চিম পাশ দিয়ে সমান্তরালভাবে এগিয়ে গেছে। সে মেপে দেখল, হেড ড্রেনটি সিনবেথ অফিস ক্রস করে এগিয়ে গেছে। তার চোখ দু'টি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। সিনবেথের ভূগর্ভস্থ টর্চার চেম্বারের সাথে তাহলে এই ড্রেনেরই একটা সংযোগ রয়েছে।

মাহমুদ নতুন এই ব্যাপারটা নিয়ে একটু চিন্তা করল। ভাবল, এই ড্রেনের পথ ধরে সিনবেথের টর্চার চেম্বারে পৌঁছা যায় কি না। গভীর চিন্তায় কপালটা তার কুঞ্চিত হলো, চোখ দু'টিও বন্ধ হয়ে এল।

একটু পরে উঠে গিয়ে লাইব্রেরী থেকে তেলআবিব শহরের 'ওয়াটার এন্ড সুয়ারেজ' ডায়াগ্রাম নিয়ে এল সে। 'সুয়ারেজ ডায়াগ্রামটা' বিস্তারিত। এতে ড্রেনগুলোর আয়তন এবং ম্যানহোলগুলোর অবয়বই সুন্দরভাবে চিহ্নিত আছে। মাহমুদ দেখল, সিনবেথ অফিসের কাছাকাছি সবচেয়ে সুবিধাজনক হল ডেভিড পার্কের ম্যানহোলটা। পার্কের বহির্দেয়ালের প্রায় গজ পাচেক ভেতরে বিরাট জলপাই গাছের তলে এই ম্যানহোল। আশে-পাশে আরও ঝাও গাছ আছে, ফুল গাছ আছে। একেবারে নির্জন জায়গা। পার্কের প্রহরীদের উপর নজর রাখতে পারলে এ ম্যানহোল নিরাপদেই ব্যবহার করা যায়।

এরপর মাহমুদ 'ডেভেলপমেন্ট অব সুয়ারেজ সিস্টেম' বইটা এনে তার উপর চোখ বুলাল। তেলআবিব লন্ডন নগরীর সুয়ারেজ সিস্টেমকেই অনুসরণ করেছে। এ সিস্টেম অনুসারে প্রশাখা ড্রেনগুলো ছাড়া হেড ও শাখা ড্রেনগুলোতে ড্রেন-বলয়ের দু'পাশে করিডোর থাকে। দু'করিডোরের মাঝখানে নালা দিয়ে বয়ে যায় ময়লার প্রবাহ। ড্রেনগুলোর সুষ্ঠু রক্ষণাবেক্ষণ এবং সংস্কার সুবিধার জন্যেই এই ব্যবস্থা। হেড ড্রেনগুলোর করিডোর দিয়ে খুব স্বচ্ছন্দেই মানুষ হেটে বেড়াতে পারে।

ওয়াটার সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম হাতে নিয়েই মাহমুদ লাইব্রেরী রুম থেকে বেরিয়ে অফিসে এসে বসল। ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল সন্ধ্যা ৬ টা।

টেলিফোন তুলে মাহমুদ আসলামকে বলল, শেখ জামালকে তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দাও।

মুহূর্ত কয়েক পরে শেখ জামাল এসে ঘরে ঢুকল। মাহমুদ তাকে বসতে ইঙ্গিত করে বলল, হারজেল এভিনিউ-এর সমান্তরালে বয়ে চলা ২নং হেড ড্রেন সিনবেথ অফিসকে ক্রস করেছে। আমরা এই ড্রেনের পথেই সিনবেথ হেড কোয়ার্টার প্রবেশ করব।

থামল মাহমুদ। চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল শেখ জামালের।

মাহমুদই আবার কথা বলল। বলল যে, আমরা যদি ডেভিড পার্কের নির্জন কোণের ম্যানহোলটি ব্যবহার করি, তাহলে আধা মাইল গিয়েই আমরা পাব 'সিনবেথ হেড কোয়ার্টার।

একটু থামল মাহমুদ। তারপর বলল, সব কিছু ঠিক ঠাক করগে। আমরা রাত ৯ টায় প্রবেশ করব ২ নং হেড ড্রেনে। আসলাম ও যায়েদ রিয়ার গার্ড হিসেবে ডেভিড পার্কের ঐ ম্যানহোল পাহারায় থাকবে। আর জন দশ বারো জন লোক ছড়িয়ে ছিটিয়ে রাখবে পার্কের আশে-পাশে। রাত দশটায় আমাদের পরিবহন ইউনিটের সালেম ও সুলাইমান দু'টো গাড়ী নিয়ে ডেভিড পার্কে যাবে।

মাহমুদ চুপ করল।

শেখ জামাল সালাম দিয়ে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

শেখ জামাল বেরিয়ে গেলে মাহমুদ আবার সেই সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম নিয়ে বসল। সিনবেথ হেড কোয়ার্টারের অবস্থান থেকে ডেভিড পার্কের ম্যানহোল পর্যন্ত দুরত্ব সে কম্পাস দিয়ে মাপল। মোট দুরত্ব হল এগার শ' চল্লিশ গজ। মাহমুদ টেলিফোনে আসলামকে জিজ্ঞেস করল, সর্বোচ্চ কত বড় টেপ আমাদের আছে আসলাম? আসলাম বলল, ১৭৬০ গজ।

মাহমুদের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল। বলল, ঠিক আছে।

বিভিন্ন সরঞ্জাম ভর্তি ব্যাগ গলায় ঝুলিয়ে গ্যাসমাস্ক পরে দড়ির মই বেয়ে ম্যানহোল দিয়ে প্রথম নামল মাহমুদ। অনেক ভেবে চিন্তে মাহমুদ বাম অর্থাৎ ড্রেনের পূর্বধারের করিডোরে নামারই সিদ্ধান্ত নিয়েছে। হারজেল এভিনিউ থেকে সিনবেথ অফিস এবং ড্রেনের দুরত্বের হিসেবে সিনবেথ অফিস ড্রেনের পূর্বধারেই পড়বে।

টর্চ জ্বেলে পূর্বপাশের করিডোরটা দেখে দড়ির মই থেকে করিডোরে পা রাখল মাহমুদ। টর্চের আলোতে কয়েকটা বড় ধরনের ইদুর ও মাকড়সা ছুটে পালাল। মাকড়সাগুলোর বিপুল বপু দেখে আঁৎকে উঠল সে। রক্তপায়ী মাকড়সার কথা মহমুদ পড়েছে, কিন্তু তারাতো ফিলিস্তিনে থাকে না।

মাহমুদ নামার পর শেখ জামালও নেমে এল দড়ির মই বেয়ে।

শেখ জামাল নেমে আসার পর দড়ির মই-এর সাথে টেপের এক মাথাকে বেধে দিল মাহমুদ। ১৭৬০ গজ দীর্ঘ টেপ থেকে সে ১১শ' ৪০ গজ কেটে নিয়ে এসেছে যাতে করে ড্রেনে নেমে সিনবেথ অফিসের লোকেশন নিয়ে মাথা ঘামাতে না হয়। টেপ যেখানে গিয়ে শেষ হবে সেটাই হবে মোটামুটিভাবে সিনবেথ অফিসের লোকেশন।

টর্চ জ্বেলে তারা দক্ষিণ দিকে চলতে শুরু করল। হাতঘড়ির সাথে ফিট করা দিক নির্দেশক কম্পাসের দিকে চেয়ে দেখল তারা ঠিক দক্ষিণ দিকেই চলছে।

মাহমুদ আগে চলছে। শেখ জামাল তার পিছনে। টর্চের আলো এবং সেই সাথে মানুষের পদশব্দে নানা ধরনের পোকা মাকড় ছুটে পালিয়ে তাদের পথ করে দিচ্ছে। করিডোরের অল্প নীচ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে নর্দমা।

'সাপ সাপ' বলে চিৎকার করে উঠে শেখ জামাল প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাহমুদের গায়ের উপর। টর্চ পিছনে ফিরিয়ে মাহমুদ দেখল, প্রায় ৫ গজ একটি উদ্যতফণা সাপ ছুটে আসতে আসতে হঠাৎ থমকে দাঁড়াল।

মাহমুদ সাইলেন্সার লাগানো রিভলভারটা তুলে ধীরে সুস্থে একটা গুলী করল। সাপটি ঝপ করে পড়ে গেল নর্দমায়।

মাহমুদ শেখ জামালকে বলল, তুমি টর্চ জ্বালিয়ে পিছনে ফিরে ধীরে ধীরে এস। তুমি পিছনটা দেখবে, আমি সামনে।

ধীরে ধীরে চলছিল তারা। হঠাৎ টেপে টান পড়ায় থামল থমকে দাড়াল মাহমুদ। বুকে ঝুলানো ব্যাগে হাত দিয়ে দেখল টেপ শেষ। তাহলে কি তারা সিনবেথের লোকেশনে পৌঁছে গেছে? ঘড়ির দিকে তাকাল মাহমুদ। দেখল ৯টা ৪০ মিনিট। ৪০ মিনিট লেগেছে তাদের ১১শ' গজ আসতে।

মাহমুদ বলল, শেখ জামাল আমরা এসে গেছি।

তারপর মাহমুদ ড্রেনের দেয়ালের দিকে ঘুরে দাড়াল। রবারের গ্লাভস খুলে হাত রাখল ড্রেনের দেয়ালে। কংক্রিটের শক্ত দেয়াল। টর্চের আলো ফেলে দেখল সিমেন্ট ঢালাই করে তৈরী, একদম সলিড। কোথাও অস্বাভাবিক কোন চিহ্ন নেই।

টেপের মাথা শেখ জামালের হাতে দিয়ে মাহমুদ বলল, তুমি এখানে দাড়াও, আমি সামনে খুঁজে দেখি। কংক্রিট কিংবা ইস্পাতের কোন দরজা আমাদের খুঁজে বের করতে হবে।

মাহমুদ টর্চ জ্বেলে ড্রেনের দেয়াল পরীক্ষা করতে করতে সমানে এগুলো। প্লাষ্টিকের বাটওয়ালা লোহার হাতুড়ি দিয়ে প্রায় ১ ফুট অন্তর অন্তর ড্রেনের দেয়ালে ঘা দিচ্ছিল মাহমুদ, ফাঁপা বা ব্যতিক্রমধর্মী কোন শব্দ কানে আসে কি না তা দেখার জন্যে। এভাবে প্রায় সে চল্লিশ গজ সামনে এগুলো, না কোন চিহ্ন কোথাও সে পেল না। আবার ফিরে এল মাহমুদ ঐভাবে পরীক্ষা করতে করতেই।

শেখ জামালের কাছ ফিরে আসার পর মাহমুদ সামনের মত পিছনের দিকটাও পরীক্ষা করতে এগিয়ে গেল। হতে পারে সিনবেথের অফিস তারা পিছনে ফেলে এসেছে। মাহমুদ যেমন সামনের দিকটা দেখেছে তেমনি পিছনের ৪০ গজ পরিমাণ দেয়ালও সে ঐভাবে পরীক্ষা করল। না, ইস্পাতের সলিড দেয়ালে কোথাও সামান্য পরিমাণ অস্বাভাবিকতারও চিহ্ন নেই।

ফিরে এল মাহমুদ আবার শেখ জামালের কাছে। তারা গা দিয়ে ঘাম ঝরছিল, কিন্তু তারা ছেয়েও উদ্বিগ্ন তার মনটা। তাহলে তারা কি ব্যর্থ হবে? মাপ অনুসারে তারা তো সিনবেথের অবস্থানেই পৌছেছে। না সিনবেথের দরজাটা

ওপার করিডোরে? মনের এ চিন্তাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে হল মাহমুদের কাছে। শেখ জামালকে সে বলল, তুমি এখানে দাঁড়াও আমি ওপারের দেয়ালটা পরীক্ষা করে আসি।

জামাল বলল, জনাব অনুমতি দিলে আমি দেখে আসি।

মাহমুদ হেসে বলল, না জামাল আমাকেই যেতে হবে।

বলে মাহমুদ বুকের ব্যাগ থেকে রবারের ডুবুরী পোশাক বের করে নিল। তারপর ওটা পরে নিয়ে নেমে গেল সে নর্দমায়। সাঁতরে ওপারে পার হয়ে গেল মাহমুদ।

ওপারের করিডোরে উঠে ডুবুরীর পোশাক পরেই সেই দেয়াল পরীক্ষার পালা সে শুরু করল। শেখ জামালের অবস্থানকে মাঝখানে রেখে, সামনে চল্লিশ গজ সে পরীক্ষা করল। না, সে একই দৃশ্য, সলিড কংক্রিটের দেয়াল, কোথাও কোন অস্বাভাবিকতার চিহ্নই নেই।

হতাশা এবং ক্লান্তিতে মাহমুদ ড্রেনের করিডোরে বসে পড়ে। তাহলে তারা কি দিক ভুল করেছে? না দিক ভুল হয়নি। চলার সময় ২ নং মূল হেড ড্রেন থেকে এর অন্য কোন শাখায় তো তারা ঢুকে পড়েনি? না সে ভুল তারা করেনি। তারা মোট দশটি শাখা ড্রেন পাশ কাটিয়ে মূল হেড ড্রেন ধরেই এগিয়ে এসেছে।

হঠাৎ তার মনে হল, টেপতো তাদের মিস গাইড করছে না? টেপের মাপ এবং ডেভিড পার্ক থেকে সিনবেথ হেড কোয়ার্টার পর্যন্ত যে মাপ সে সুয়ারেজ ডায়াগ্রাম থেকে নিয়েছে তা কি নিখুঁত? ডায়াগ্রামে ড্রেনের জিগ -জ্যাগকে তার কাছে তো তখন বড় বলে মনে হয়নি, কিন্তু বাস্তবে তো এই জিগ-জ্যাগ দুরত্বের ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য সৃষ্টি করে! মেপে দেখার সময় মাহমুদের এ কথাটা মোটেই মনে হয়নি। এই ভুলের জন্যে নিজের চুল নিজেই ছিড়তে ইচ্ছা করল মাহমুদের। কিন্তু পরক্ষণেই সচেতন হল, এ সময় অধৈর্য হলে চলবে না, সাহস হারালে চলবে না।

মাহমুদ চিন্তা করে দেখল, তার হিসেব ভুল হবার অর্থ হলো ড্রেনে প্রকৃত দৈর্ঘের চেয়ে টেপের মাপ কম হওয়া। অর্থাৎ তাদের আরও সামনে এগুতে হবে।

মাহমুদ নর্দমা পার হয়ে শেখ জামালের কাছে ফিরে এল। বলল, শেখ জামাল আমাদের আরও সামনে এগুতে হবে। শেখ জামাল বলল, চলুন জনাব, ইনশাআল্লাহ আমাদের লক্ষ্য আমরা খুঁজে পাবই।

-ইনশায়াল্লাহ' বলে মাহমুদ সামনে পা বাড়াল।

মাহমুদ এবার পাশের দেয়ালসহ চারিদিকটা ভালভাবে পরীক্ষা করেই ধীরে ধীরে সামনে এগুতে লাগল। টেপের সাথে দু'শ গজের একটা প্লাষ্টিক কর্ড বেধে তারা সামনে এগুতে লাগল।

করিডোর এবং দেয়ালের উপর টর্চের আলো ফেলে এবং হাতুড়ি দিয়ে কংক্রিটের দেয়াল ঠুকে ঠুকে সে সামনে এগুচ্ছিল। হঠাৎ এক জায়গায় করিডোরের উপর কয়েক খন্ড ইলেকট্রিকের লালরঙা তার টর্চের আলোর চিক চিক করে উঠল। মাহমুদের চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠল। ঝুকে পড়ে তার তুলতে গিয়ে সিগারেটের একটা খন্ডও তার চোখে পড়ল। সিগারেটের খন্ডটাও সে তুলে নিল। সিগারেটের ফিল্টার দেখেই বুঝল, অত্যন্ত দামী সিগারেট। ইলেকট্রিকের তার এবং সিগারেটের খন্ডের উপর জমে ওঠা ময়লার পরিমাণ থেকে মাহমুদ বুঝল, এ দুটো জিনিষই খুব আগের নয়।

মাহমুদ বলল, শেখ জামাল আল্লাহ বোধ হয় আমাদের দয়া করেছেন। আমরা বোধ হয় মনজিলে পৌঁছে গেছি।

হঠাৎ মাথা বরাবর দেয়ালের গায়ে বর্গাকৃতি কাল একটি বর্ডার তার নজরে পড়ল। হাত দিতে গিয়েও চমকে টেনে নিল সে হাত। বুকে ঝুলানো ব্যাগ থেকে ডেটোনেটর বের করে কালো বর্ডারের মাঝখানের দেয়াল স্পর্শ করে বুঝল, ওটা সিমেন্ট রং-এর ইলেকট্রিফায়েড ইস্পাত। চারধারটা কালো রাবারের বর্ডার।

ফিস্ ফিস্ করে মাহমুদ বলল, শেখ জামাল, এটাই সেই দরজা। দু'জনেই আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করল।

কিভাবে এগুবে একটু চিন্তা করল মাহমুদ। যেহেতু বিদ্যুৎ সুইচটা ভেতরে তাই বিদ্যুতায়িত এই দরজা থেকে বিদ্যুৎ ডিসকানেক্ট করার কোন উপায় নেই। এখন একটিই পথ এবং তা হলো গোটা দরজা কেটে নামিয়ে আনা। কিন্তু

ঘরের ভেতরটা নিরাপদ না করে দরজা কেটে নামানোর অর্থ শত্রুকে স্বাগত জানানো।

চিন্তা করছিল মাহমুদ। একটা রবারের নল ঢুকানো যাবে, এমন ফুটা কিভাবে ইস্পাতের এই দরজায় করা যায়? ল্যাসার বিম দিয়ে মুহূর্তে এটা করা সম্ভব। কিন্তু বিদ্যুতায়িত ইস্পাতে ল্যাসার প্রয়োগ করলে বিস্ফোরণ ঘটতে পারে। এটা হলে তার আসল কাজ নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আরো ভাবল মাহমুদ। অবশেষে অনেক চিন্তা করে খুব সন্তর্পণে রবারের বর্ডার এবং কংক্রিটের দেয়ালের সংযোগ স্থলে ল্যাসার রস্মি প্রয়োগ করে আধা ইঞ্চি ব্যাসের একটা ফুটো করল। ফুটো দিয়ে একটা রাবারের নল ঢুকিয়ে দিল। বিনা বাধায় নলটি ফুটখানেক প্রবেশ করায় সে বুঝল নলটি নিশ্চয় ঘরে প্রবেশ করেছে। এরপর মাহমুদ সেই রাবারের নলের প্রান্ত ফ্লাইং ক্লোরোফরমের কনটেইনারের সাথে জুড়ে দিয়ে সুইচ অন করে দিল। এক মিনিট অন করে রাখার পর সুইচ অফ করে দিল মাহমুদ।

পাঁচ মিনিট অপেক্ষা করার পর মাহমুদ রাবারের বর্ডার বরাবর ইস্পাতের দরজার চারদিকে ল্যাসার বিম চালিয়ে দরজাটা কেটে ফেলল। সশব্দে ভারি দরজাটা পড়ে গেল করিডোরের ওপর। দরজার নীচের প্রান্তের সাথে একটা ইলেকট্রিকের তার যুক্ত ছিল, দরজার ভারে তার ছিড়ে গেল। বিদ্যুতায়নের উৎস ছিল ঐ তারটি। মাহমুদ তারটির মুখ টেপ দিয়ে মুড়ে দিল।

মাহমুদ মনে করেছিল ইস্পাতের দরজাটা খুললেই সিনবেথের ভূগর্ভস্থ কক্ষে প্রবেশ করা যাবে, কিন্তু তা হলো না। এ দরজার পরে চার পাচঁ গজ লম্বা একটা সুড়ঙ্গ, তারপর আরেকটা দরজা। সেটাও ইস্পাতের।

মাহমুদ শেখ জামালকে ড্রেনের করিডোরে অপেক্ষা করতে বলে সেই সুড়ঙ্গে উঠে গেল। ডেটোনেটর দিয়ে দেখল দ্বিতীয় এ দরজা বিদ্যুতায়িত নয়। তার সন্দেহ হলো, তার আগের ক্লোরোফরম এ দরজা ডিঙ্গিয়ে সরে যেতে পেরেছে কি না!

কোন সন্দেহের অবকাশ না রাখার জন্যে মাহমুদ দরজার গোড়ায় লেসার বিম দিয়ে ছোট্ট একটা ফুটো করে রাবারের নল দিয়ে ফ্লাইং ক্লোরোফরম

আবার চালান করে দিল ঘরের ভেতরে। ঘরে যদি কেউ থাকে গন্ধহীন এ ক্লোরোফরম নিমিষে তাদের ঘুম পাড়িয়ে দেবে।

ক্লোরোফরম চালান দেবার পর দু'তিন মিনিট অপেক্ষা করল মাহমুদ। তারপর ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার এক পাশে বড় ধরনের ফুটো করল। চোখ লাগাল সে ফুটোয়, দেখল উজ্জ্বল আলোয় ঘরটি ভরে আছে। ঘরে কেউ নেই। মনটা মাহমুদের ছ্যাঁৎ করে উঠল। তাহলে তার সব চেষ্টা বৃথা যবে।

হঠাৎ তার চোখ পড়ল ঘরের একপাশে মেঝের ওপর। ভালো করে দেখা যায় না। মনে হল, মেঝের ওপর একটা তক্তপোষ। সে তক্তপোষের ওপর মানুষের মত কিছু শুয়ে আছে, কাপড় দেখে বুঝা যায়। ওকি এমিলিয়া! দেহের রক্ত তার চঞ্চল হয়ে উঠল। বুকটা তোলপাড় করে উঠল তার।

মাহমুদ তাড়াতাড়ি ল্যাসার বিম দিয়ে দরজার দুপাশটা কেটে ফেলল। তারপর দরজা একপাশে সরিয়ে রেখে ছুটে গেল ঘরে তক্তপোষের কাছে। এক পলক এমিলিয়াকে দেখে পরীক্ষা করে ছুটে গেল সে বাইরের দরজায়। দরজাটা বন্ধই ছিল, লক করে দিল মাহমুদ। তারপর দৌড়ে গিয়ে সে বিদ্যুতায়নের সেই তারটা নিয়ে এল। প্লাকটি খুলে রেখে তারের মুখ থেকে টেপ খুলে নিয়ে সেটা সে জুড়ে দিল বাইরের দরজার সাথে। তারপর প্লাকটি আবার লাগিয়ে দিল। ডেটোনেটর দিয়ে পরীক্ষা করে নিশ্চিত হল যে, দরজাটি বিদ্যুতায়িত হয়েছে। খুশী হল মাহমুদ।

এবার সে ছুটে এল এমিলিয়ার কাছে। আবার নাকে হাত দিয়ে দেখল সব ঠিক আছে।

তাড়াতাড়ি সে তার বাধনগুলো কেটে তাকে গ্যাসমাস্ক পরিয়ে কাঁধে তুলে নিল।

তারপর সেই সুড়ঙ্গ দিয়ে নেমে এল ড্রেনের করিডোরে।

ফিরতি যাত্রা শুরু হলো তাদের।

এক হাতে কাঁধে এমিলিয়াকে ধরে, অন্য হাতে টর্চ জ্বালিয়ে আগে আগে হাটছিল মাহমুদ। তার পিছনে শেখ জামাল, সেই আগের মত করে।

এমিলিয়কে নিয়ে এসে তেলআবিব শহরের পূর্বাঞ্চলে পার্ক ষ্ট্রীটের একটি বাড়ীতে এনে তোলা হল। বাড়ীটির সামনে সাইন বোর্ড 'দানিয়েল এ্যান্ড কোং'।

পূর্ব তেলআবিবে দানিয়েল এ্যান্ড কোম্পানীর প্রধান সেল্‌স ডিপো। বাড়ীটি জনৈক ইহুদীর নিকট থেকে অতি সম্প্রতি ক্রয় করেছে মাহমুদ। বাড়ীর বাইরের অংশে ক্রয়-বিক্রয়ের কাজ চলে আর ভিতরের অংশ ব্যবহৃত হয় সাইমুমের হাসপাতাল হিসেবে। একজন মহিলা ডাক্তার ও একজন নার্স এমিলিয়ার দেখা শোনার ভার নিল।

জ্ঞান ফিরে পেয়েই চোখ মেলল এমিলিয়া। সুন্দর খাটে নরম ধবধবে বিছানায় শুয়ে আছে সে। লাল কার্পেট মোড়া মেঝে। সাদা রং-এর দেয়াল। খাটের পাশে সাদা টেবিলে ঔষধের শিশি ও গ্লাস। কোথায় অপারেশন চেম্বারের শক্ত মেঝে, আর কোথায় জাকজমকপূর্ণ গৃহের নরম শয্যা। স্বপ্ন দেখছে না তো সে। গায়ে চিমটি কেটে দেখল-না স্বপ্ন নয়।

এমন সময় ঘরে ঢুকল নার্স। গায়ে সাদা আরবী পোশাক। মাথায় সাদা রুমাল। এমিলিয়াকে চাইতে দেখে সে দ্রুত তার পাশে এসে নরম গলায় বলল, কেমন লাগছে?

জবাব না দিয়ে এমিলিয়া বলল, আমি কোথায়? আপনি কে?

-আপনি নিরাপদ স্থানে আছেন। বলল নার্স।

কিছু বলার জন্য মুখ হা করেছিল এমিলিয়া। হঠাৎ ঘরে প্রবেশ করল মাহমুদ।

কথা বলতে পারল না এমিলিয়া। মুখ তার হা হয়েই রইলো অভিভূতের মত চেয়ে রইল সে মাহমুদের দিকে। ঠোঁট কাঁপতে লাগল তার। অবরুদ্ধ এক উচ্ছাসে কাঁপছে সে। উচ্ছাস ছাপিয়ে নেমে এল দু'গন্ড বেয়ে অশ্রুর ধারা। মুখ কাত হয়ে পড়ল বালিশে। বালিশে মুখ গুজে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল এমিলিয়া।

নার্স অনেক আগেই বেরিয়ে গিয়েছিল।

মাহমুদ ধীরে ধীরে গিয়ে এমিলিয়ার পাশে বসল। বলল, কেদোঁ না এমি, ভয়ংকর সে দুঃস্বপ্নের ইতি হয়েছে।

কান্না বেড়ে গেল এমিলিয়ার। কান্নার বেগে কাঁপছে তার দেহ। এমিলিয়ার রেশমের মত নরম চুলে হাত বুলিয়ে সান্ত্বনা দিতে ইচ্ছ হচ্ছিল মাহমুদের। কিন্তু পারছিল না। বিবেকের কঠোর শাসানি তার সামনে। নতুন পরিবেশে, নতুন পরিচয়ে এমিলিয়া আজ এক মহিমাময়ী নারী। কাছে পেয়েও তাকে মনে হচ্ছে দুরে। সামান্য স্বোচ্ছাচারিতার অবকাশও তাদের মধ্যে নেই যেন আজ।

অবসাদে যেন ভেঙে পড়ছে এমিলিয়া। কান্না তার থেমে গেছে। কিন্তু মুখ তুলছে না সে।

নার্স গরম দুধ নিয়ে ঘরে ঢুকলো। মাহমুদ পাশের একটি চেয়ারে গিয়ে বসেছিল। এমিলিয়াকে দুধ খাইয়ে চলে গেল নার্স। মাহমুদ বলল, এখন উঠি এমি, সকালে আসব।

-কোথায় যাবে, আমি কোথায়? অস্ফুট প্রায় একটি প্রশ্ন।

-কেন নিজের বাড়ীতে। মাহমুদের ঠোঁটে হাসি।

এমিলিয়া কোন জবাব দিল না। চোখ দু'টি নামিয়ে নিল সে। মাহমুদ বলল, কেন বিশ্বাস হচ্ছে না?

-বিদ্রুপ করছ তুমি আমাকে মাহমুদ? এমিলিয়ার কণ্ঠ ভারি শোনাল।

-বিদ্রুপ নয়, সত্যি বলছি, আমি এ বাড়ীতে থাকি না বটে, তবে এটা আমারই বাড়ী।

এমিলিয়া কোন কথা বলল না। নীরব দৃষ্টি মেলে চেয়ে রইল শুধু। দৃষ্টিতে তার সে কি বিশ্বাস আর নির্ভরতা।

মাহমুদই কথা বলল আবার, তোমার নিরাপত্তার ব্যবস্থা আমরা করেছি কোন ভয় নেই। একটু থেমে মাহমুদ আবার বলল, আমি তোমাকে একেবারে আমার ওখানেই তুলতে পারতাম, কিন্তু তা করিনি। তুমি তো জান, আমার শূন্য ঘরে তোমার পদধুলি পড়বে, সে সৌভাগ্যের দিন আমার এখনো আসেনি। বলেই

মাহমুদ উঠে দাঁড়াল। বলল এখানে যারা আছে যাদের তুমি দেখবে, সকলকেই নিজের লোক মনে করো। যে কোন অসুবিধার কথা তাদের জানিও।

মাহমুদ বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

এমিলিয়া অপসৃয়মান মাহমুদের দিকে চেয়েছিল। তার চোখ দু'টি উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বালিশ দু'হাতে আঁকড়ে ধরে মুখ লাগালো সে বালিশে।

সেদিন এমিলিয়ার মা আইরিনা তার ঘরে এমিলিয়ার ফটো সামনে নিয়ে বসেছিল। মায়ের কয়েক ফোটা অশ্রু গিয়ে পড়েছে এমিলিয়ার বাধানো ফটোর আয়নায়। এমিলিয়া চলে যাবার পর থেকে এভাবেই কাঁদছে আইরিনা। আইরিনা সেই যে সিনবেথ অফিসে গেছে, তারপর আর কোন খোঁজ নেই তার। এতটুকুই শুধু জানা গেছে যে, তার জিজ্ঞাসাবাদ চলছে। এ জিজ্ঞাসাবাদ কেমন তা ভাবতেও শিউরে উঠে আইরিনা। সেই থেকে এমিলিয়ার বাবাও বোবা হয়ে গেছে। কোন কথাই সে বলে না। আইরিনার অনেক কাদাকাটার পর গতকাল শুধু একটা কথাই বলেছিল, মেয়েটা আমার সসম্মানে মৃত্যুবরণ করতে পারুক, এর চেয়ে বেশী আর কিছু চেয়ো না আইরিনা। কিন্তু ওরা তো মারবে না, কষ্ট দেবে। এ কষ্ট দেবার টেকনিক আমরা হিটলারের কাছে শিখে এসেছি।' স্বামীর এ কথাগুলো মনে পড়ায় আবার নতুন করে কেঁপে উঠল আইরিনা, অশ্রুর ঢল নামল দু'চোখ বেয়ে।

এ সময় একটা খবরের কাগজ হাতে ঘরে প্রবেশ করল ডেভিড সালেম। কাগজের একটা খবর স্ত্রীর কাছে মেলে ধরে বলল, পড়।

চোখ মেলে স্বামীর দিকে চেয়ে খবরের ওপর চোখ নিবদ্ধ করল আইরিনা। খবরটির শিরোনাম এরূপ,

“সিনবেথের দুর্ভেদ্য অপারেশন কক্ষ
থেকে আসামীর পলায়ন”

আর খবরে বলা হয়েছে, গতকাল রাতে সিনবেথের ভূগর্ভস্থ অপারেশন কক্ষ থেকে অতি গোপনীয় রাষ্ট্রীয় দলিল পাচারের দায়ে ধৃত আসামী জনৈকা

এমিলিয়া পলায়ন করেছে। জানা গেছে, কে বা কারা ভূগর্ভস্থ ড্রেনের পথে দৃঃসাহসিক অভিযান চালিয়ে সিনবেথের অপারেশন কক্ষ থেকে তাকে উদ্ধার করে নিরাপদে পালিয়ে গেছে।.....

খবরটা পড়া শেষ না করেই আইরিনা স্বামীকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'ঈশ্বর আমাদের দেখেছেন, আমাদের মেয়েকে বাঁচিয়েছেন।'

ডেভিড সালেমের চোখেও তখন অশ্রু।

এ সময় দরজায় নক হলো।

আইরিনা স্বামীকে ছেড়ে দিয়ে বলল, ইসাকের মা এস।

পরিচারিকা ইসাকের মা ঘরে প্রবেশ করে একটা চিঠি ডেভিড সালেমের হাতে দিল।

সাদা দামী ইনভেলাপ। এ ধরনের ইনভেলাপের ব্যবহার ইসরাইলে নেই। ইনভেলাপের ওপর কারও নাম লেখা নেই। বিস্মিত ডেভিড সালেম ইনভেলাপ ছিঁড়ে একটা চিঠি বের করল। চিঠির কাগজটিও অত্যন্ত দামী। চিঠিটি পড়ল ডেভিড সালেম,

সম্মানিত ডেভিড সালেম,

আপনাদের মেয়ে এমিলিয়া ভাল আছেন, সুস্থ আছেন। নিরাপদ মনে করলে আপনাদের কাছেই পাঠাতাম। কিন্তু তা পারছি না।

-মাহমুদ

চিঠিটি পড়ে ডেভিড সালেম বলল, কোথায় পেলে ইসাকের মা এই চিঠি?

ইসাকের মা বলল, একজন ফুলওয়ালা এই চিঠি দিয়ে গেছে। ইসাকের মা বেরিয়ে গেল।

আইরিনা চিঠিটি পড়ে মেঝেতেই সেজদায় পড়ে গেল মুসার খোদার উদ্দেশ্য।

সেজদা থেকে উঠে আবেগ জড়িত কন্ঠে বলল, বলতে পার এই মাহমুদ কে?

ডেভিড সালেম বলল, কে আমি জানি না, অনুমান করতে পারি, সাইমুমরা ছাড়া এ দেশে এত শক্তিশালী আর কেউ নেই।

একটু থেমে সে বলল, মাহমুদ যদি সাইমুমের হয় তাহলে আমাদের মেয়ে সম্পর্কে আমরা নিরাপদ থাকতে পারি।

এ সময় টেলিফোন বেজে উঠল।

ডেভিড সালেম টেলিফোন ধরলে ওপার থেকে সিনবেথ প্রধান ডোবিন বলল, স্যার আমরা আপনার সহযোগিতা চাই। এমিলিয়ার কোনও তথ্য যদি পান.....

ডেভিড সালেম ডোবিনকে কথা শেষ করতে না দিয়েই বলল তোমার কথা আমি বুঝেছি ডোবিন। আমার অবস্থা তুমি জান, পরে কথা বলব তোমার সাথে।

বলে টেলিফোন ছেড়ে দিয়ে এসে আইরিনার হাত থেকে চিঠিটি নিয়ে ছিড়ে ফেলল। চিঠি ছিড়তে ছিড়তে সে বলল, বুঝলে আইরিনা ডোবিন আমার কাছ থেকে এমিলিয়ার খোঁজ চায়। ওরা ভুল করছে। আমি ইহুদী বটে' কিন্তু আমি একজন পিতাও ঐ অমানুষরা তা ভুললো কি করে।

৭

ইসরাইলের প্রতিটি লোকালয়-পল্লী-নগরীতে সপ্তবার্ষিক ‘সাবাত’ দিবসের মহা আনন্দের বারতা নিয়ে উদিত হল ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য। প্রতি সাত বছর পর পালিত হয় এই উৎসব। ধর্মীয় বিধান অনুসারে এই দিন অর্থকরী সকল প্রকার কাজকর্মে ব্যাপৃত হওয়া সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। কোন কাজে ব্যাপৃত হওয়া মহাপাপের কাজ তাদের জন্য। ইসরাইলের এটা সাধারণ ছুটির দিন। খেত-খামার, কল-কারখানা, অফিস-আদালত, ব্যবসায়-বাণিজ্য, দোকান-পাট সবকিছুর দরজা এদিন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ থাকে। মহা আনন্দের বন্যায় প্লাবিত হয়ে যায় এদিন প্রতিটি ইহুদী জনপদ। এ ২৭ শে ফেব্রুয়ারীর সূর্যও সেই মহা আনন্দের বারতা নিয়ে এল ইসরাইলে।

তবে এবারের ‘সাবাত’ দিবস ইসরাইলের কাছে আরও তাৎপর্যময়। দু’দিন আগে ইসরাইলের সাথে আরব রাষ্ট্রসমূহের শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে, সেই সাথে ইসরাইল তাদের স্বীকৃতি লাভ করেছে। অবশ্য এজন্য তাকে অধিকৃত এলাকা ছাড়াও আরো অনেকখানি ইসরাইলী এলাকা ছেড়ে দিতে হয়েছে। জেরুজালেম থেকেও তাদের হাত গুটিয়ে নিতে হয়েছে-সরে যেতে হয়েছে তাদেরকে ১৯৪৮ সালের পাটিশন সময়ের মূল এলাকার মধ্যে। তবু বহু বছর পর আজ শান্তি ও স্বস্তি লাভ করেছে ইসরাইলিরা। তাদের মাথার উপর যে উদ্যত খাঁড়া ঝুলছিল তার ভীতি থেকে তারা আজ মুক্ত হয়েছে। তাই আজকের ‘সাবাত’ দিবস ইসরাইলিদের কাছে সৌভাগ্যের সূচনাকারী হিসেবে উপস্থিত হয়েছে। তাই সারা ইসরাইলে আজ বাধনহারা আনন্দের বন্যা। সেনাবাহিনীর ব্যারাক হতে শুরু করে কুলি-মজুরের অঙ্গন পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছে এই আনন্দ।

সারাদিন ধরে চলেছে আনন্দ। ইসরাইল জন-জীবনে আজ কোন নিয়ন্ত্রণ নেই, কোন আইনের বাধন যেন নেই কোথাও। সন্ধ্যার আগমনে আনন্দ উৎসব আরও জমে উঠল। তেল-আবিবের ৪১টি সিনেমা হল, ২৭টি নাট্য মঞ্চ, ১৭টি

পাবলিক হলে আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে। সৈনিক, ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, অফিসার প্রভৃতি সকলেই আজ এসে জমা হয়েছে এসব আনন্দানুষ্ঠানে। এছাড়াও বিভিন্ন মহল্লায় শামিয়ানা টাঙ্গিয়ে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সেনাবাহিনীর গ্যারিসনসমূহে তাদের নিজস্ব মিলনায়তনেও আয়োজন হয়েছে জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানের। ইসরাইলের সকল শহরে আজ একটিই দৃশ্য। ইহুদী-পল্লী-জনপদেও এরূপ আনন্দানুষ্ঠানের ব্যবস্থা হয়েছে। দেশের এই আনন্দানুষ্ঠানে মিলিত হয়নি শুধু মুসলিম ও ডোজি সম্প্রদায়। ইহুদীদের ধর্মানুষ্ঠানের সাথে তাদের কোন যোগ নেই।

রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ইসরাইলে আজ যে শীর্ষ আনন্দানুষ্ঠানের আয়োজন হয়েছে, তার স্থান হয়েছে ষ্টেট এ্যাসেম্বলি হল। এখানে রাষ্ট্র প্রধান থেকে শুরু করে মন্ত্রিসভা ও পার্লামেন্ট সদস্য, উর্ধতন সরকারী কর্মচারী এবং সশস্ত্র বাহিনীর শীর্ষস্থানীয় অফিসারবৃন্দ সমবেত হয়েছেন।

গ্রীন লজের ওয়্যারলেস রুম। ওয়্যারলেসের সামনে বসেছিল আহমদ মুসা এবং মাহমুদ।

সন্ধ্যা ৭ টা পেরিয়ে গেছে। ইসরাইলের বিভিন্ন শহর ও সাইমুমের অন্যান্য আঞ্চলিক ঘাঁটি থেকে রিপোর্ট আসছে, তারা সে রিপোর্ট পরীক্ষা করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিচ্ছে। সিনাই অঞ্চল, জর্দান উপত্যকা ও গোলান হাইট এলাকা থেকে সকল সাইমুম ইউনিটকে ইসরাইলের অভ্যন্তরে সরিয়ে আনা হয়েছে। কেন্দ্রীয় সংগঠনের সকল কর্মীকেও এনে সমবেত করা হয়েছে ইসরাইলে। ইসরাইলের বিভিন্ন ঘাঁটিতে তারা ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় নেতৃত্বকে তারা পরামর্শ ও সহযোগিতা দান করছে। তাদের কাছ থেকে রিপোর্ট আসছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম জমে উঠেছে আহমদ মুসা ও মাহমুদের কপালে।

ইসরাইলের সমস্ত ঘাঁটিতে সাইমুমের সকল ইউনিট প্রস্তুত। সকলের মধ্যে হালকা অস্ত্র বিতরণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। চূড়ান্ত মুহূতটির জন্য অপেক্ষা

করছে সকলেই। রাত্রি দশটা এক মিনিটে মাইমুমের অপারেশন স্কোয়াড তার কাজ শুরু করবে। এর অর্ধ ঘন্টা পরে পাবলিসিটি স্কোয়াডের কাজ শুরু হবে। রাত্রি ১২ টায় রেডিও ঘোষণা করবে অভ্যূত্থানের কথা। সেই সঙ্গে শুরু হবে ডিপ্লোম্যাটিক এবং এডমিনিষ্ট্রেসন স্কোয়াডের তৎপরতা।

সকল ঘাঁটির সাথে যোগাযোগ সম্পন্ন করে ওয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল আহমদ মুসা। কিন্তু মাহমুদ বসে রইল ওয়ারলেস সেটের সামনে। সমস্ত মনোযোগ তার ওয়্যারলেস সেটের দিকে নিবদ্ধ।

ওয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এসে আহমদ মুসা মিটিং রুমে প্রবেশ করল। একটি গোল টেবিল ঘিরে বসেছিল সাইমুমের রাজনৈতিক বিভাগের প্রধান আমিন আল আজহারি, সামরিক পরিকল্পনা বিভাগের প্রধান আবদুল্লা আমর। জেনারেল মোশে হায়ান ও জেনারেল রবিনকে চেয়ারের সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখা অবস্থায় দেখা গেল। তাদের চোখ বাঁধা।

আহমদ মুসা এসে চেয়ারে বসতেই আমিন আল-আজহারি তার দিকে একটি বিবৃতির খসড়া এগিয়ে দিল। গভীর মনোযোগের সাথে তাতে চোখ বুলাল আহমদ মুসা। এখানে-সেখানে কয়েকটা সংশোধন আনল। এ নিয়ে সে নিম্নস্বরে আবদুল্লাহ আমরের সাথে পরামর্শ করল। তারপর সে আমিন আল-আজহারিকে বললো, একটি ফ্রেস কপি তৈরি করুন।

আহমদ মুসা উঠে গিয়ে জেনারেল হায়ান ও জেনারেল রবিনের চোখের বাঁধন খুলে দিল। চোখের বাঁধন খুলে যেতেই ওরা পিট পিট করে সবার দিকে চোখ তুলল, দেখে নিল ঘরটাকেও একবার। আহমদ মুসা চেয়ারে এসে বসল। ততক্ষণে ফ্রেস কপি তৈরী হয়ে গেছে।

আহমদ মুসা কাগজটি হায়ানের সামনে বাড়িয়ে দিয়ে বলল, পাঠ করুন কাগজটি। কাগজটি জেনারেল রবিনকে দিয়েও পাঠ করানো হল। পাঠ করে তারা চমকে উঠল। পরিপূর্ণ দৃষ্টি মেলে দেখল তারা সবাইকে। মোশে হায়ান বলল, এর অর্থ কি, কে আপনারা?

আহমদ মুসা বলল, পরিচয় পর্ব পরেও হতে পারবে, কিন্তু তাড়াতাড়ি মেসেজটি আমাদের রেকর্ড করানো দরকার, ওটাই আগে হোক। বলে সে ড্রয়ার

থেকে একটি ছোট্ট মাউথ পিস বের করে তার সামনে তুলে ধরল। দেশবাসীর উদ্দেশ্যে মেসেজটি একবার পাঠ করুন মিঃ হায়ান।

হায়ান বলল, আমি পাঠ করতে পারি না, আমাদের ব্লাক মেইলিং করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা কঠিন কন্ঠে বলল, আমরা খেলা করতে বসিনি মিঃ হায়ান, সময় নষ্ট করবেন না। পাঠ করুন, অথবা মৃত্যুর জন্য তৈরী হোন। বলে আহমদ মুসা রিভলভার বের করে ডান হাতে রেখে বামহাতে মাউথ পিসটি তুলে ধরল হায়ানের সামনে। লৌহ মানব বলে কথিত এক চক্ষু বিশিষ্ট হায়ানেরও মুখ পাংশু হয়ে গেল। সে মুসার স্থির অচঞ্চল চোখে কি যেন পাঠ করল, তারপর পাঠ করে গেল মেসেজটি। জেনারেল রবিনও অনুসরণ করল হায়ানকে।

রাত্রি নয়টা তিরিশ মিনিট। উৎসব মুখর তেলআবিব নগরী। সাইমুমের ট্রাফিক ইউনিট সাধারণ পথচারীর ছদ্মবেশে শহরের রোডে মোতায়েন হয়ে গেছে। হ্যান্ড গ্রেনেড ও ষ্টেনগান সজ্জিত তারা। সেই চরম মুহূর্তটিতে যানবাহন ও পথ চলাচল সম্পূর্ণ অচল করে দেয়াই হবে তাদের কাজ। কারফিউ নিয়ন্ত্রণও করবে তারা। নির্দিষ্ট সময়ে টেলি-যোগাযোগ বিকল করে দেয়াও তাদের দায়িত্ব। ৯-৪৫ মিনিটে সাইমুম অপারেশন স্কোয়াডের কর্মীরা গণ জমায়েতের স্থানগুলোতে পজিশন নিয়ে নিল। বিশেষ করে টেষ্ট এ্যাসেম্বলী হল ও গুরুত্বপূর্ণ গভর্ণর-দফতর গুলোতে তারা অলক্ষ্য অবরোধের সৃষ্টি করে দাঁড়াল। টেলিফোন-টেলিগ্রাফ, টেলিভিশন ও বেতার কেন্দ্র এবং সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের প্রতি গুরুত্ব আরোপ করা হল সবচেয়ে বেশী।

ঢং ঢং করে তেলআবিবের ঘড়িতে রাত্রি দশটা বেজে গেল। পেটা ঘড়ির শেষ ঘন্টাটি বাতাসে মিলিয়ে যাবার সাথে সাথে ইসরাইল আর্মির প্রতীক আকাঁ দু'খানা জীপ সেনাবাহিনীর হেড কোয়ার্টারের বিশাল গেটে গিয়ে দাঁড়াল। গেটের দু'পাশে গার্ড রুম থেকে দুইজন মিলিটারি পুলিশ এগিয়ে এল জীপের দিকে। দুই জীপে মোট দশজন লোক ইসরাইল আর্মির পোশাক পরা। প্রত্যেকের সোলডার ব্যান্ডে অফিসারের ইনসিগনিয়া। মিলিটারী পুলিশ এক নজর তাকিয়েই ষ্টেনগান নামিয়ে ফিরে চলল। তারা ফিরে দাঁড়াতেই জীপ থেকে দু'টি রিভলভার একই

সঙ্গে অগ্নিউদগীরণ করল। সাইলেন্সার লাগানো রিভলভার। কোন শব্দ হলো না। লোক দু'টিও নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল গেটের গোড়ায়। জীপ দু'টি তীরবেগে ঢুকে গেল ভিতরে। ঢুকে একটি সোজা রাস্তা ধরে চলে গেল জেনারেলের অফিসের দিকে। আর একটি চলে গেল ইসরাইল আর্মির 'আরসেনাল' ফিল্ডের দিকে।

জেনারেলের অফিসমুখী জীপের নেতৃত্ব দিচ্ছিল মাহমুদ স্বয়ং। ঝড়ের গতিতে এগিয়ে চলছিল জীপ। আর মাত্র পঁয়ত্রিশ সেকেন্ড বাকি। এ সময়ে মধ্যে তাকে জেনারেলের অফিসে পৌঁছতে হবে। ঐতো দেখা যাচ্ছে জেনারেলের অফিস, তাঁর সুদৃশ্য গেট। গ্রাউন্ড ফ্লোরেই বসেন জেনারেল। কিন্তু গ্রাউন্ড ফ্লোরটি গ্রাউন্ড লেবেল থেকে প্রায় বিশ ফুট উঁচু। জেনারেলের অফিসের তলদেশে ইসরাইল আর্মির হেড অয়্যারলেস কনট্রোল কেবিন।

জেনারেলের উন্মুক্ত গেটে দেখা যাচ্ছে দু'জন মিলিটারী পুলিশ। জীপ দেখে তাদের হাতের ষ্টেনগান উঁচু হয়ে উঠল। গুলীর রেঞ্জে ওরা আসতেই মাহমুদ নির্দেশ দিল, ফায়ার। দু'টি রিভলভার একই সঙ্গে আবার অগ্নি-উদগীরণ করল। নিঃশব্দ সে গুলী। কোন চিৎকারও উঠল না নিঃশব্দে লুটিয়ে পড়ল লোক দু'টি। গেটে গিয়ে গাড়ী দাঁড়াতেই মাহমুদ লাফ দিয়ে নেমে গেট পেরিয়ে ক্ষীপ্ত পদে সিঁড়ির দিকে ছুটল। তার পিছনে আরও দু'জন। অন্য দু'জন মেশিনগান নিয়ে দাঁড়াল গেটে।

মাহমুদ সিঁড়ি ভেঙে উঠে একটি করিডোর পেরিয়ে জেনারেলের অফিসের বদ্ধ দরজার সামনে দাঁড়াল। দরজার পাশে ডান দিকে জেনারেলের সেক্রেটারীর অফিস। সে মাহমুদদের দেখে হকচকিয়ে উঠে দাঁড়িয়েছে। তার সোলডার ব্যান্ডে কর্ণেলের ইনসিগনিয়া। মাহমুদের রিভলভার নিঃশব্দে অগ্নি বৃষ্টি করল। কানের পাশ দিয়ে ঢুকে গেল সে গুলী। টেবিলের উপরই লুটিয়ে পড়ল সে। শব্দ হল পতনের।

মাহমুদ দ্রুত দরজা ঠেলে প্রবেশ করল ভিতরে, সঙ্গী দু'জনের মধ্যে একজন দরজায় পাহারায় থাকল, আর একজন মাহমুদের সঙ্গে ঘরে প্রবেশ করল।

ঘরে ঢুকে মাহমুদ দেখল, ইসরাইল সশস্ত্র বাহিনীর সহকারী অধিনায়ক জেনারেল আব্রাহাম উঠে দাঁড়িয়েছে। তার চোখে উৎকণ্ঠিত দৃষ্টি, হাতে রিভলভার। কিন্তু তার রিভলভার উঠানোর সময় হলো না। মাহমুদের রিভলভার আর একবার অগ্নি উদগীরণ করল। জেনারেল আব্রাহামের কব্জি ভেদ করে তা বেরিয়ে গেল। জেনারেল আব্রাহামের বাম হাত টেবিলের নীচে নেমে যাচ্ছিল। মাহমুদের রিভলভারের আর একটি গুলী জেনারেল আব্রাহামের বাম বাহু ভেদ করল। চেয়ারে বসে পড়ল জেনারেল। মাহমুদ গর্জে উঠল, 'যেমন আছেন ঠিক তেমনি দাঁড়িয়ে থাকুন। জানি এবার লেগ বক্সের বোতাম টিপে কনট্রোল রুমে নেমে যেতে চেষ্টা করবেন। পা নড়াবার চেষ্টা করলে তৃতীয় গুলীটি এবার আপনার বক্ষ ভেদ করবে।

জেনারেল আব্রাহামকে সামনে রেখে তার পিছু পিছু মাহমুদ কনট্রোল রুমে প্রবেশ করলো। মাহমুদের পিছনে প্রবেশ করল ওয়্যারলেস ইঞ্জিনিয়ার আবদুল্লা আমিন।

আবদুল্লা আমিন মিটার ইনডেক্স অনুসরণ করে ইসরাইলের বিভিন্ন গ্যারিসনের সাথে সংযোগ-চ্যানেল প্রতিষ্ঠা করল। তারপর সে চ্যানেলগুলোকে হেড ট্রান্সমিটারের সাথে যুক্ত করল।

ওদিকে মাহমুদ প্রাক্তন দেশরক্ষা মন্ত্রী জেনারেল মোশে হায়ান ও প্রাক্তন সর্বাধিনায়ক জেনারেল রবিনের স্বাক্ষরকৃত বিবৃতি জেনারেল আব্রাহামকে দেখাল। তারপর আর একটি লিখিত বিবৃতি জেনারেল আব্রাহামের চোখের সামনে তুলে ধরে বলল, 'এবার পাঠ করুন তো জেনারেল।' বলে সে রেকর্ডার যন্ত্রের সুইচ অন করল। তারপর রিভলভারের নলটি জেনারেলের কপাল বরাবর তুলে ধরে বলল, এক আদেশ কিন্তু দু'বার করার মত সময় আমাদের নেই।

জেনারেল আব্রাহামের আহত হাত থেকে রক্ত ঝরছিল, কাঁপছিল সে। বোধ হয়ে বুঝল সে, সামনের ঐ লোকটি দু'বার আদেশ করার লোক নয়। বিবৃতিটি সে পাঠ করে গেল,

দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী পুতুল সরকারের পতন ঘটেছে। দেশপ্রেমিক শক্তি দেশের নেতৃত্বভার গ্রহণ করেছে। আমার রাজনীতি-

নিরপেক্ষ সেনাবাহিনীকে সাময়িকভাবে অস্ত্র ত্যাগ করতে এবং পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে আদেশ করছি।

মেসেজটি আবদুল্লা আমিন ট্রান্সমিট করল। রাত্রি তখন দশটা এগার মিনিটি।

মেসেজ ট্রান্সমিট করার ১ম ও ২য় মিনিটে জাফা ও হাইফা নৌ-ঘাঁটি থেকে খবর এল। একই ধরনের খবর, "প্রায় সকলেই বিভিন্ন আনন্দানুষ্ঠানে যোগ দিয়েছে, ঘাঁটিগুলো প্রায় শূন্য। অজ্ঞাত পরিচয় একদল লোক ঘাঁটি দখল করেছে। ওরা কনট্রোল রুমে ঢুকতে চেষ্টা করছিল। এখন খুলে দিচ্ছি কনট্রোল রুম।" ৩য় মিনিটে তেলআবিব, লুদ, মাসাদা ও বিরশিবা বিমান ঘাঁটি থেকে খবর এল। তেলআবিব ও লুদ জানাল, "আমরা কিছু বুঝতে পারছি না। বাইরে গুলীর শব্দ শুনতে পাচ্ছি। শব্দ নিকটতর হচ্ছে ক্রমে। পাইলট ও অফিসার্স ব্যারাক শূন্য, ঘাঁটিতে রুটিন পেট্রোল শুধু কাজ করছিল।" মাসাদ ও বিরশিবা বিমান ঘাঁটি জানাল, রুটিন পেট্রোলের সাথে ছিটেফোটা সংঘর্ষ হয়েছে বলে মনে হচ্ছে। সমগ্র বিমানক্ষেত্র অজ্ঞাতনামা ব্যাক্তিদের দখলে। আমরা কনট্রোল রুম ছেড়ে যাচ্ছি।'

মাহমুদ তার নিজস্ব অয়্যারলেসে এখানকার খবর এবং প্রাপ্ত অন্যান্য খবর জানিয়ে দিল গ্রীণ লজের হেডকোয়ার্টারে আহমদ মুসাকে।

মাহমুদ যখন জেনারেল অফিসের দখল নিচ্ছিল, তখন এহসান সাবরির নেতৃত্বে আর একটি দল বিদ্যুৎগতিতে আঘাত হেনে প্রহরায় নিযুক্ত এক প্লাটুন সৈন্যের প্রতিরোধ চূর্ণ করে হেড কোয়ার্টারের আরসেনাল ফিল্ড দখল করে নিয়েছিল। আরসেনাল ফিল্ড অধিকারে 'ডজি' সম্প্রদায়ের সৈন্যদের মূল্যবান সহযোগিতা পেয়েছিল এহসান সাবরি।

অপরদিকে আবদুল্লা জাবেরের নেতৃত্বে সাইমুমের এক হাজার সদস্যের একটি দল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত হয়ে সেনাবাহিনীর ব্যারাকসমূহ দখল করে নিয়েছিল। অধিকাংশ ব্যারাক প্রায় শূন্য ছিল। আর্মি, পুলিশ, পেট্রোল ও উপস্থিত অন্যান্য সশস্ত্র সৈন্য কোথাও কোথাও বিচ্ছিন্ন প্রতিরোধের সৃষ্টি করলেও সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ কোথাও হয়নি। ব্যারাকে তিন হাজার 'ডজি' সম্প্রদায়ের সৈনিক কোন প্রতিরোধ করেনি। রাত্রি দশটা ত্রিশ মিনিটের মধ্যে সমগ্র ব্যারাক এলাকা

সাইমুমের কর্মীসেনারা দখল করে নিয়েছিল। গ্যারিসনের এ্যাসেম্বলি হল ও ব্যারাক এলাকা থেকে রাত্রি সাড়ে দশটার মধ্যে তিন হাজার ইসরাইলি সৈন্য ধৃত হয়েছিল। শহরের ৪১ টি সিনেমা হল, ২৭টি নাট্যমঞ্চ, ১৭টি পাবলিক হল ও অন্যান্য অনুষ্ঠান এলাকা থেকে ১৭ হাজার সমরিক বাহিনীর লোকসহ মোট ৫০ হাজার ইসরাইলি যুবক গ্রেপ্তার হল। সাইমুমের ট্রাফিক ইউনিট ও লোকাল ইউনিটের হাতে গ্রেপ্তার হল আরও ১১ হাজার লোক।

রাত্রি ১০-৩০ মিনিটে তেলআবিব আর্মি গ্যারিসন থেকে সাইমুমের সাঁজোয়া বাহিনী বিভিন্ন ইউনিটে বিভক্ত হয়ে তেলআবিবের রাস্তায় টহল দিতে শুরু করল। পাবলিসিটি স্কোয়াডের কাজও তখন শুরু হয়ে গেছে। রাস্তায় রাস্তায় ঘোষণা করা হচ্ছে, 'দেশের জনগণের সাথে বিশ্বাস ঘাতকতাকারী পুতুল সরকারের পতন ঘটেছে। জনগণকে শান্তভাবে গৃহে অবস্থান করতে অনুরোধ করা হচ্ছে।'

ষ্ট্রেট এ্যাসেম্বলী হলে রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট ও মন্ত্রী সভার সদস্য, উর্ধ্বতন সামরিক ও বেসামরিক কর্মচারীদের সকলেই গ্রেপ্তার হয়েছে। তেলআবিবের পেটা ঘড়িগুলোতে আর রাত্রি ১২টা বাজার ঘন্টাধ্বনি শোনা গেল না। রাত্রি ১২টা বাজার আগেই গোটা তেলআবিব সাইমুমের হাতের মুঠোয় এসে গেল। সাইমুমের ১০ হাজার কর্মীসেনা ভারী অস্ত্রে সজ্জিত হয়ে তেলআবিবে টহল দিয়ে ফিরছে।

রাত্রি এগারটা পঞ্চাশ মিনিটে আহমদ মুসা কপালের ঘাম মুছতে মুছতে গ্রীনলজের অয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে এল।

অয়্যারলেস রুম থেকে বেরিয়ে সে প্রবেশ করল মিটিং রুমে। ওখানে বসেছিল সাইমুমের উপদেষ্টা পরিষদ। আহমদ মুসা তাদের সামনে সানন্দে ঘোষণা করল, 'ভ্রাতৃবৃন্দ, আল্লাহর হাজার শোকর, ফিলিস্তিনের প্রতিটি শহর ও গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলোতে সাইমুম তার অধিকার প্রতিষ্ঠা করেছে। সকল আর্মি

গ্যারিসন, হাইফা ও ওজাফা নৌ-ঘাঁটির কামানশ্রেণী এখন আমাদের দখলে। সাবমেরিন ও যুদ্ধ জাহাজগুলোকে এখন নিয়ন্ত্রণ করছে সইমুমের নৌ-ইউনিট।' দাঁড়িয়ে কথা বলছিল আহমদ মুসা।

বাইরে ষ্টার্ট নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল গাড়ী। আহমদ মুসা, আমিন আল আজহারি ও সাইমুমের ডিপ্লোম্যটিক করপসের প্রধান সোহায়েল আবদুল্লা গাড়ীতে আরোহন করলে বেতার-কেন্দ্র অভিমুখে তা যাত্রা শুরু করল।

রাত্রি ১২টা ১ মিনিট। ইসরাইল রেডিও থেকে ঘোষকের গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, 'অন্যায়, অবিচার আর জুলুমের প্রতীক ইসরাইল সরকারের পতন ঘটেছে। 'দানিয়েল এ্যারোন'-এর নেতৃত্বে নুতন জাতীয় সরকার দেশের শাসনভার গ্রহণ করেছে।' উল্লেখ্য যে, ইহুদী সমাজে মাহমুদ 'দানিয়েল এ্যারোন' নামে পরিচিত।

এই ঘোষণার পরই জেনারেল হায়ান ও জেনারেল রবিনের বিবৃতি প্রচার করা হলো। বিবৃতিতে বলা হল,

"দেশের প্রকৃত মালিক জনসাধারণের সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী সরকারকে উৎখাত করে এ দেশের যে নয়া সরকার, নয়া প্রশাসন ও নয়া ব্যবস্থার জন্ম হল, তার সাথে দেশের সশস্ত্র বাহিনী, দেশের জনসাধারণ এবং বিদেশে আমাদের শুভানুধ্যায়ী সকলের একাত্মতা রয়েছে। এই পরিবর্তন এই দেশ ও এই অঞ্চলের মানুষের জীবনে নিয়ে আসবে স্থায়ী শান্তি।'

বিবৃতি প্রচারের পর দানিয়েল এ্যারোন সরকারের পক্ষ থেকে কতিপয় নির্দেশ ও ঘোষণা প্রচার করা হল,

(১) পরবর্তী আদেশ না দেয়া পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবত থাকবে।

(২) পরবর্তী আদেশ ঘোষিত না হওয়া পর্যন্ত দেশের সকল অফিস-আদালত ও কল-কারখানা বন্ধ থাকবে।

(৩) দেশের সকল নৌ ও বিমান বন্দর অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

(৪) আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সকল বিদেশীকে দেশত্যাগ করতে হবে। সশস্ত্র বাহিনীর নিজস্ব বিমানে তাদেরকে নিকটতম কোন রাজধানীতে পৌঁছে দেয়া হবে।

(৫) বৈদেশিক মিশনের সকলকে তাদের নিজস্ব এলাকায় অবস্থান করতে বলা হচ্ছে। নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের সরবরাহ তারা নিয়মিত পাবে।

(৬) দেশের বৈদেশিক ও অর্থনৈতিক নীতিসমূহ অপরিবর্তিত থাকবে। এ সম্পর্কীত পূর্ববর্তী সকল চুক্তি ও প্রতিশ্রুতিসমূহের মর্যাদা অক্ষুন্ন রাখা হবে।

রেডিও থেকে মাঝে মাঝে উপরোক্ত বিবৃতি ও ঘোষণা প্রচার হতে থাকল। এরই মাঝে উদিত হল ২৮শে ফেব্রুয়ারীর সূর্য। এই সূর্য লক্ষ লক্ষ ফিলিস্তিনবাসীর জীবনে নিয়ে এল নতুন দিন নতুন ভবিষ্যত।

৭ ই মার্চ। সাইমুমের অভ্যূত্থানের পর **১১** দিন পার হয়ে গেছে। এই **১১** দিনে ওলট পালট হয়ে গেছে ইসরাইলের চেহারা। দু'যুগেরও বেশী আগে যে সব ফিলিস্তিনি দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল, তারা সকলেই ফিরে এসেছে দেশে। সাইমুমের এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন স্কোয়াড নতুন প্রশাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করেছে। অফিস-আদালত ও কল-কারখানায় এবং কৃষিক্ষেত্রে ফিলিস্তিনের আদি ইহুদী বাসিন্দাদের অধিকারে কোন হস্তক্ষেপ করা হয়নি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর যেসব ইহুদী ফিলিস্তিনে এসেছে, তাদেরকে অফিস-আদালত ও কল-কারখানা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। ফিলিস্তিনে অবাঞ্ছিত বহিরাগত হিসেবে তাদের গণ্য করা হয়েছে। ইলাতের নিকটবর্তী দুর্গম পার্বত্য এলাকার আশ্রয় শিবিরে ইসরাইলের পাঁচ লক্ষ সামরিক, আধাসামরিক ও উগ্র যুবশক্তিকে অবরুদ্ধ করে রাখা হয়েছে। সাইমুম এদের কে জিম্মি হিসেবে রেখেছে। ফিলিস্তিনের জাতীয় সরকারের ওপর বাইরের ইহুদী মুরব্বীদের প্ররোচনায় বাইরে থেকে কোন আঘাত এলে এদের ওপর আঘাত হানা হবে। বিদেশী ইহুদী মুরুব্বীদের ষড়যন্ত্রের পাল্টা উত্তর হিসেবে এদের কে ব্যবহার করবে সাইমুম।

এই **১১** দিনে সাইমুম ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের সেনাবাহিনী গড়ে তুলেছে। সাইমুমের কর্মীসেনাসহ ফিলিস্তিনের পাঁচ লক্ষ মুসলিম যুবককে নিয়ে এ সেনাবাহিনী গঠিত হয়েছে। ফিলিস্তিনকে একটি অস্ত্রাগারে পরিণত করেছিল ইসরাইলিরা। সুতরাং অস্ত্রের অভাব হয়নি। সউদি আরব, জর্দান ও লিবিয়ার বিমান বাহিনী ও নৌ-বাহিনীর অফিসার ও ক্রুদের সঙ্গোপনে ফিলিস্তিনে আনা হয়েছে। তারা ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের বিমান ও নৌ-বাহিনীকে পূর্ণ কর্মক্ষম করে তুলেছে। মিসর, পাকিস্তান ও ইরান থেকে আণবিক বিশেষজ্ঞদের আণবিক গবেষণা ও পরীক্ষা কেন্দ্র নেগিও মরুভূমির ডেমনায় আনা হলো।

আভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সম্পর্কে নিশ্চিত হবার পর অফিস-আদালত ও কল-কারখানার কাজ শুরু করা হলো।

এরও ৭ দিন পর ডেমনার ১১টি আণবিক বোমাকে ব্যবহারোপযোগী করে তোলা হল এবং মূহূর্তের নোটিশে তা লক্ষ্যবস্তুতে আঘাত হানতে পারবে এমন প্রস্তুতি সম্পন্ন হবার পর বিমান ও নৌ-বন্দর খুলে দেয়া হলো। কিন্তু অনুসৃত আভ্যন্তরীণ নীতি সম্পর্কে কঠোর গোপনীয়তা রক্ষা করা হলো। প্রচার নয়, দ্রুত কাজ-এই নীতি গ্রহণ করল সাইমুম নিয়ন্ত্রিত নতুন জাতীয় সরকার। ঘটনা প্রবাহের স্বাভাবিক বিকাশের ফলে যেটুকু প্রকাশ পায়, তার বেশী কিছু প্রকাশ করতে চায় না সরকার।

অভ্যুত্থানের দিন সাতেক পর চীন ও ফ্রান্সসহ অধিকাংশ আফ্রিকা, এশিয়া ও পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের স্বীকৃতি পাওয়া গেল। তবে মুসলিম দেশগুলো বোধগম্য কারণেই ফিলিস্তিনে জাতীয় সরকার সম্পর্কে কঠোর নীরবতা পালন করছে। তাদের এই নীরবতার ফলে ফিলিস্তিন বিপ্লবের সঠিক প্রকৃতি সম্পর্কে মুসলমানদের চিহ্নিত শত্রুরা কিছু আঁচ করতে সমর্থ হলো না।

জাতিসংঘ মিশন ও বিদেশী সাংবাদিকদের রিপোর্ট থেকে ফিলিস্তিনের নতুন সরকার সম্পর্কে বাইরে যে ধারণা দাঁড়াল তা হল, ইসরাইলের নতুন সরকার একটি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী সরকার। ইহুদী, খৃস্টান ও মুসলমান সকলেই সেখানে সমান অধিকার লাভ করবে। ফিলিস্তিনের লক্ষ লক্ষ বাস্তুহারা মুসলমান তাদের পূর্বের বাস্তু-ভিটা ফিরে পাচ্ছে। অপরদিকে লক্ষ লক্ষ বহিরাগত ইহুদী তাদের নাগরিক অধিকার হারিয়ে উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠীতে পরিণত হচ্ছে।

মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হলো বিশ্বের রাজধানীগুলোতে। একমাত্র দক্ষিণ আফ্রিকা ছাড়া আফ্রিকা ও এশিয়ার প্রত্যেকটি দেশ ফিলিস্তিন জাতীয় সরকারের নীতি সমর্থন করল। অভিনন্দিত হলো সরকার। এই সময় মুসলিম দেশগুলো প্রায় এক সাথে ফিলিস্তিন সরকারকে আনুষ্ঠনিকভাবে স্বীকৃতি জ্ঞাপন করল।

বৃটেন নতুন সরকারের সমালোচনা করল এবং নতুন ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যার দিকে জাতিসংঘের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। সোভিয়েত ইউনিয়ন নীরবতা অবলম্বন করল। বোঝা গেল, কিছুটা অস্বস্তি বোধ করছে সোভিয়েত সরকার।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার ঘটল আমেরিকায়। ভীষণ হৈ চৈ শুরু হলো সেখানকার ইহুদী সার্কেলে। কিন্তু ফিলিস্তিনের নতুন সরকার প্রশ্নে মার্কিন সিনেট ও কংগ্রেস ও সিনেটের একটি শক্তিশালী গ্রুপ মার্কিন ইহুদীদের ইসরাইল নীতির তীব্র সমালোচনা করল। তারা পরিষ্কার ভাবে জানাল, "মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে আর তারা ইহুদীদের হাতের পুতুল সাজতে দিবে না। ইহুদী স্বার্থ উদ্ধারের জন্য আর তারা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ব্যবহৃত হতে দিবে না।" মার্কিন ইহুদীদের তারা আরও পরামর্শ দিল, হৈ চৈ করে ইহুদী উদ্বাস্তু সমস্যার সমাধান করা যাবে না। যেমন করে বিশ্ব ইহুদী মুরুব্বীরা ফিলিস্তিনে ইহুদী রপ্তানী করেছিল, ঠিক তেমনি ভাবেই উদ্বাস্তু ইহুদীদের সেখান থেকে ফিরিয়ে আনা উচিত। অথবা ফিলিস্তিনি আরব মুসলমানদের সেই আবাসভূমিতে বিশ্বস্ত পড়শী সেজে বসবাস করার মানসিকতা ইহুদীদের সৃষ্টি করতে হবে।

পরবর্তী বই

আবার তেলআবিবে